শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
স্মরণে

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৩
শ্রীমতী রেণুকণা ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
মুদ্রক : অনাদিনাথ কুমার, উমাশংকর প্রেস, ১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

নিবেদন

বেশ কয়েক মাস হাওড়ায় ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু'র সরকারী বাসায় ছিলাম। তখন সন্ধ্যের পর হাতে কিছুটা অবসর থাকত। তাই হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের গ্রন্থাগার থেকে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের 'মহাভারতম্' আনিয়ে মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখতে আরম্ভ করি। ধীরে ধীরে মূল মহাভারতের সঙ্গে আমার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ও হয়, অবশ্য 'ভারতকৌমুদী'র সাহায্যে। তারপর মাস কয়েক আগে হঠাৎ মনে হ'ল যে সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখলে কেমন হয়। প্রাথমিক পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাব্লিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। তারপর একদিন খোঁজ-খবর নিয়ে দেব লেনের বাড়ীতে সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের তৃতীয় পুত্র প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনি সব শুনে আমাকে সানন্দে ও সাগ্রহে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কাছে গিয়ে অনেক কথা শুনেছি ও অনেক কিছু জেনেছি। কিছুদিন পরে তাই —সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের পুণ্যজীবনকাহিনী রচনা করাই স্থির করলাম। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিনটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্যের অবাধ সঞ্চরণ। তিনি আমাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মদনমোহন কুমার ও সেখানকার কর্ম্মীবৃন্দের বিশেষ ক'রে শ্রীঅনাদি দাসের সাহায্য ও সহৃদয়তার কথাও ভোলার নয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছি অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের মত জ্ঞান ও কর্ম্মে ভাস্বর জীবনের রূপকার হবার যোগ্যতা যে আমার নেই সে কথা সব সময়েই আমার মনে হয়েছে। তবু এ জীবনকাহিনী রচনার পুণ্যলোভই আমাকে পরিচালিত করেছে।

হরিদাসের সাহিত্যকর্ম্মের প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা করার চেষ্টাও করিনি। কাজেই সে ব্যাপারে সুধীজনেরা হতাশ হবেন। রচনাগত ত্রুটি, পরিমিতি বোধের অভাব এবং আরও অনেক বিচ্যুতি যে পণ্ডিতদের চোখে ধরা পড়বে তাও বুঝি। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু এই যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যা রয়ে গেল তার মূলে আছে

অযত্ন নয়, অনভিজ্ঞতা। উদ্ধৃতির বাহুল্যকে অনেকে বিদ্যার জাহিরিপনা বলেও মনে করতে পারেন। সাফাই হিসেবে আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করে গেলাম যে বক্তব্যগুলি নিজের কেরামতিতে পরিষ্কার করতে না পেরেই বার বার অন্যের লেখা থেকে ধার করেছি। আর এই জীবনকাহিনীটিকে হরিদাসের জন্মশত-বার্ষিকীর পুণ্যক্ষণে অনধিকারী হলেও তাঁরই এক অকৃত্রিম অনুরাগীর শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে মনে করলেই, কৃতকৃতার্থ হব।

হরিদাসের দু'জন ছাত্র—সর্বশ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মৌলিক, কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধায়, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ তাঁদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব সম্পর্কে দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের বাড়ীর অনেকেই, বিশেষ করে তাঁর নাতনী শ্রীমতী আরতি গুহ (যোগেশবাবুর কন্যা) আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সব শেষে বললেও সব থেকে কৃতিত্বের কথা হ'ল বিশ্ববাণীর ব্রজকিশোর মণ্ডলের। তিনি হাজার কাজের ভিড়েও আশ্চর্য্য দ্রুততা ও যত্নের সঙ্গে বইটির প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।

ঘরে ও বাইরে আরো অনেকে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁদের সকলের নাম লেখা সম্ভব নয়, তাই তাঁদের কথা মনের মধ্যেই ধরে রেখে দিলাম। ইতি—

বিনয়াবনত
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

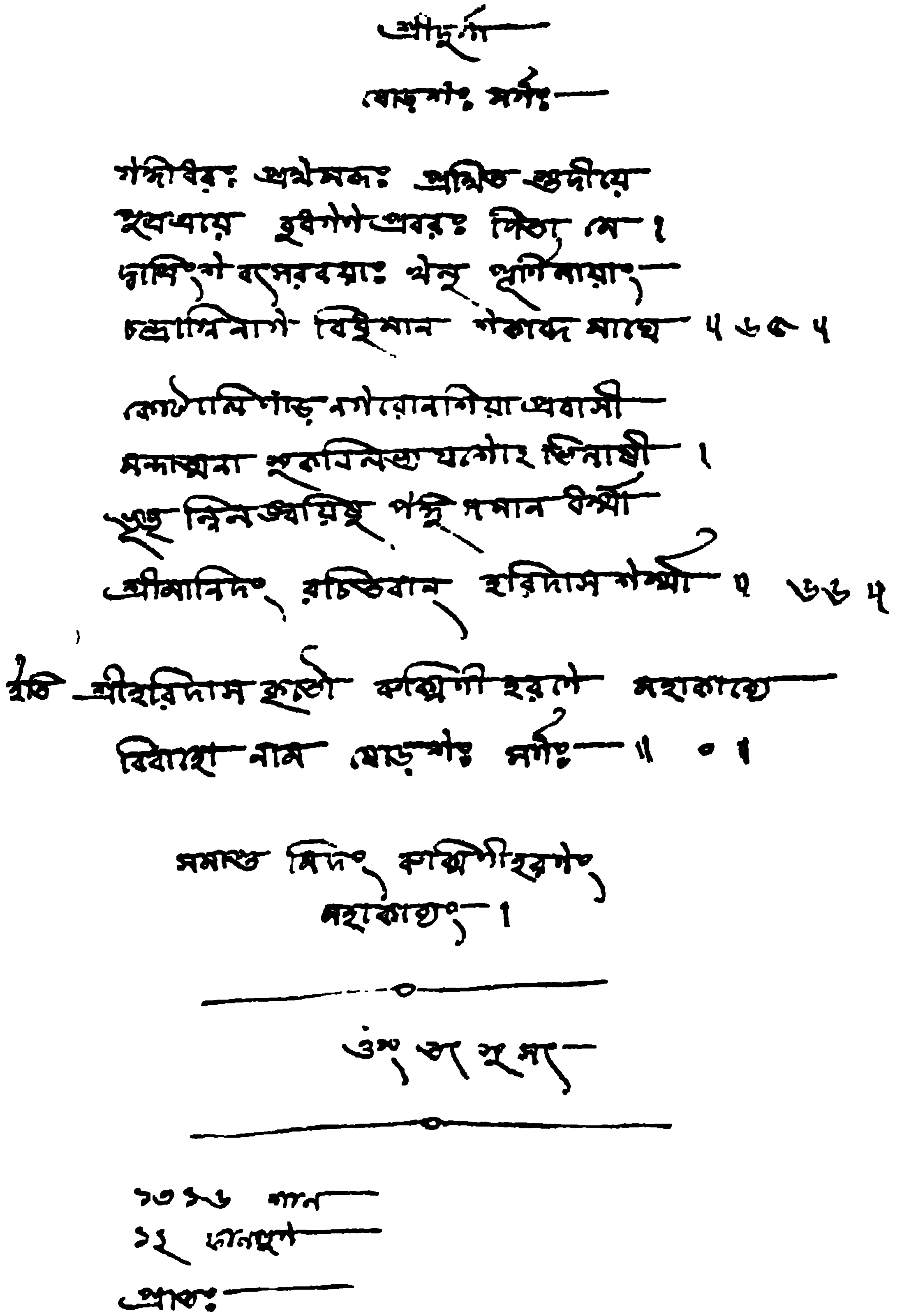

শ্রীদুর্গা

ষোড়শঃ সর্গঃ

গঙ্গাধরঃ প্রথমজঃ প্রথিত স্তদীয়ে
হবংশয়ে বুধগণপ্রবরঃ পিতা মে ।
দ্বাত্রিংশবৎসরবয়াঃ খলু পূর্ণিমায়াং
চন্দ্রাগ্নিনাগবিধুমান শকাব্দ মাঘে ॥৬৫॥

কোটালিপাড় নগরোনশিয়াপ্রবাসী
মন্দাত্মনা সুকবিনিন্দ্য যশোঽভিলাষী ।
ভূত্বা ন্নিনজ্জয়িষু পদ্ম সমান বীর্য্যা
শ্রীমানিদং রচিতবান্ হরিদাস শর্ম্মা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীহরিদাসকৃতৌ রুক্মিণীহরণে মহাকাব্যে
বিবাহো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ০ ।

সমাপ্ত মিদং রুক্মিণীহরণং
মহাকাব্যং ।

ওঁ তৎ সৎ

১৩১৬ সাল
১২ ফাল্গুন
প্রাতঃ

'রুক্মিণীহরণের' পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

১৮৭৬ সালের ২২শে অক্টোবর, (১২৮৩ সালের ৭ই কার্ত্তিক) রবিবার, ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামের বিখ্যাত নোয়াবিদ্যালঙ্কার বাড়ীর অন্দরমহল থেকে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। বারবাড়ীতে পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার, পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও অন্যান্য পুরুষেরা আশ্বস্ত হলেন এবং হাতে পৈতে নিয়ে বোধহয় আশীর্বাদ করলেন—'চিরং জীবতু'। পাড়াপড়শীরাও আনন্দ সংবাদ আন্দাজ করে নিলেন—মাতা বিধুমুখীর কোল জুড়ে এসেছে এক পুত্র সন্তান। পিতামাতার প্রথমপুত্র হরিদাস জন্ম নিলেন।

হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে—"মাতৃদেবীর নিকট শুনা গেল—কাশীচন্দ্র বাচস্পতির পশ্চিমের ঘরের সম্মুখের (বর্ত্তমান ধোনাদের* ঘরের সম্মুখের) উঠানে আমার জন্ম হইয়াছিল। (১৩৪৬ সালে ৫ জ্যৈষ্ঠ লেখা হইল)"।

বিদ্যালঙ্কার মশায় নিশ্চয় যথাসময়ে জাতকের তিথি, লগ্ন, রাশি , গণ ও দশা নির্ণয় করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে হরিদাসের জন্ম তুলা লগ্নে ও শনির দশায় ; এবং তাঁর ধনুরাশি ও রাক্ষসগণ। এ সব তথ্যের সন্ধান মেলে হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে—

"শুভমস্তু। শকনরপতে—রতীতাব্দাদয় : ১৭৯৮।৬।৬৩।৩০ সৌর কার্ত্তিকস্য সপ্তম দিবসে রবিবাসরে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চম্যান্তিথৌ—দিবা ত্রিংশৎ পলাধিক তৃতীয় দণ্ডাভ্যন্তরে শুভ তুলালগ্নে শুক্রস্য ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং বুধস্য দ্রেক্কাণ দ্বাদশাংশে ত্রিংশাংশেষু, কুজস্য নবাংশে, রর্বেযামার্দ্ধে চন্দ্রস্য দণ্ডে মূলা নক্ষত্রাশ্রিত ধনুরাশৌ চন্দ্রে শ্রীমদ্ গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কারস্য শুভ প্রথম শ্রীকুমারো জাতবান্ ।চিরং জীবতু। রাক্ষসগণোহং। মূলা নক্ষত্রে জাতত্বাৎ শর্নেদশায়াং জন্ম। তস্য ভুক্ত বর্ষাদয়ঃ। ৮।৪ ।"

বিদ্যালঙ্কার মশায় নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কলকাতার অসাধারণ জ্যোতিষী কালিচরণ আচার্য্যের ছাত্র। শাস্ত্রমতে তিনি নিশ্চয়ই নবজাত পুত্রের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য বিচার করেছিলেন। সেদিনের সেই অসহায় হরিদাসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন শাস্ত্রের

---

* কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী

আলোতে ? তিনি কি বুঝেছিলেন যে কর্মে ও কীর্তিতে ভাস্বর এক মহাজীবনের অধিকারী হবে তাঁর এই প্রথম পুত্র ? এ সব কথা আজ আর আমাদের জানার কোনো উপায় নেই ।

কোটালিপাড়া পরগণা নবভারতের 'নৈমিষারণ্য' বলে যুক্তিযুক্ত ভাবেই আজ পরিচিত । কিন্তু পূর্ববঙ্গের সুদূর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার এই জলমগ্ন পরগণাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমাদের অনেকেরই জানা নেই । উৎসাহী পাঠক ১৯২৫ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার্স-এর মাধ্যমে জানতে পারবেন অনেক খবর ।...“এখানে বিশেষভাবে রক্ষিত একটি দুর্গ আছে । ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয় । এই দুর্গই এই স্থানের প্রধান আকর্ষণ । ইহার দেওয়ালগুলি ১৫ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দুই হইতে আড়াই মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ । ইহার আয়তন সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কেহ বলেন, ইহা আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং আড়াই মাইল প্রস্থ । আবার কাহারও মতে, ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়দিকেই দুই মাইল । যাহাই হউক না কেন, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের বৃহত্তম দুর্গ । ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত দুই মাইল দৈর্ঘ্য এবং এক বা দেড় মাইল প্রস্থ 'গড়জরিপ' নামে যে দুর্গটি আছে—তাহার সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে । এইরূপ অনুমান করা হয়, 'কোটালিপাড়া'র অর্থ (কোট = দুর্গ ; আলি = দুর্গের চারিদিকে দেওয়াল বা দেওয়াল-সংলগ্ন জমি এবং পাড়া = লোকালয় বা বসতি) দুর্গের দেওয়াল সংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয় ।” [১৩৭৩ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের প্রবাসী—'যযুর্বেদীয় বৈদিক কাশ্যপ-বংশাবলী' (কোটালিপাড়া, উনশিয়া ফরিদপুর)—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-বিনোদ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-পুরাণতীর্থ, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের দ্বিতীয় পুত্র]

গেজেটীয়ার-প্রণেতার এই বিধিবদ্ধ বিবরণের মধ্যে কলকাতা থেকে কোটালিপাড়ার অন্তবিহীন পথের কোনো হদিস অবশ্য মেলে না । সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের তৃতীয় পুত্র প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একদিন দেব লেনের বাড়ীতে বসে বললেন—

“সে সব ১৯৩৯/৪০ সালের কথা । আমার বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছর হবে । তখনই আমি শেষবারের মতো কোটালিপাড়ায় যাই । প্রথমে ত বেশ ট্রেনে করে খুলনা গিয়ে হাজির হলাম । তারপরই সুরু হ'ল জলপথ । প্রথম কিস্তিতে স্টীমার । প্রায় ৮/৯ ঘণ্টা ধরে চলেছে ত চলেইছে । মাঝে মাঝে এখানে

সেখানে থামে বটে, কিন্তু সে সব জায়গায় চোখ মেলে দেখার মত কিছু নেই। শেষে প্রায় চল্লিশ মাইলের মতো পথ পেরিয়ে স্টীমারটী 'পাটগাতি'তে এসে থামল। একটা পাটের গুদাম ও এলোমেলো ভাবে ছড়ানো দু'চারটে দোকান নিয়েই পাটগাতি। সেখানে নেমে বাবা যথাসাধ্য আচার-বিচার বাঁচিয়ে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর আমরা উঠে বসলাম নৌকায়। সে পথ যেন শেষই হতে চায় না, আর সময়ও কাটে না। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল; কানে আসে সেই দাঁড় ফেলার একঘেয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ আওয়াজ। কত না ছোট বড় নদী, খাল বিল খাড়ি পেরিয়ে নৌকো জল কেটে চলেছে—কখনও আস্তে কখনও জোরে। কিন্তু সব পথই একসময় শেষ হয়; তাই বোধহয় ৯/১০ ঘণ্টা পরে আমরাও কোটালিপাড়ায় পৌঁছে গেলাম। তবু ত আমাদের ভাগ্য ভাল—বড় একটা কচুরিপানার ঝাড়ের সামনে পড়িনি। সে সব ঝাড় ঠেলে আসতে হলে নাকি গোটা দিনই লেগে যেত। আপনারা কলকাতার আশেপাশের লোক—চোখে না দেখলে আমাদের উনশিয়া গ্রামের চেহারা ছবি আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। চারিদিক ঘিরে শুধু জল আর জল; তারই মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মতো জেগে থাকত গ্রামগঞ্জ ও গাছগাছালি। বর্ষার দিনে এবাড়ী ওবাড়ী করতেও নৌকো বা ভেলার দরকার হত। জনস্রোত অবশ্য তখন সবে মাত্র শহরের দিকে গড়াতে সুরু করেছে। তাই গ্রামগুলি বেশ ধনে জনে সরগরমই ছিল। এই ধরুন না কেন, আমাদের কাশ্যপপাড়া ছিল লোকে একেবারে ঠাসা। চলতি একটা কথাই ছিল—

বারোশ ব্রাহ্মণ তেরোশ আড়া।
তাহার নাম কাশ্যপ পাড়া॥

পাকা দালান কোঠা আমাদের পাড়ায় বড় একটা ছিল না। তবে ব্যবসায়ী সাহাদের একটী একতলা পাকা বাড়ী দেখেছি বলেই মনে পড়ে।"

এবার আবার গেজেটীয়ারের পাতার দিকে চোখ ফেরানো দরকার। O'Malley সাহেব বলেছেন যে 'কোট' কথাটী থেকেই কোটালিপাড়া নামের উৎপত্তি। কোটের হাতার মধ্যে গড়ে-ওঠা লোকালয়ের কোটালিপাড়া নামে চিহ্নিত হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য একটি ব্যাখ্যাও অবশ্য চালু আছে। 'কোটাল' কথাটী 'কোতোয়াল' শব্দের অপভ্রংশ। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে থানার সদর বলেই লোকালয়টীর নাম কোটালিপাড়া। কিন্তু এ যুক্তি আমাদের মনে ধরে না। প্রথমেই খট্‌কা লাগে যে এই অঞ্চলে যখন প্রথম লোকালয় গড়ে উঠতে শুরু করে

তখনই কি সেখানে একটা থানা বসে যায় ? আরও কথা আছে। প্রহরী বা রক্ষকের জমকালো নাম কোটাল, কোটালি নয়। কোতোয়ালীর অপভ্রংশও কোটালি নয়। কোটালি মানে ত কোটালগিরি। তাছাড়া জেলার সদর থানাকেই শুধু কোতোয়ালী নামের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। এবং সে সব থানাকে কোতোয়ালীই বলা হয়, কোটালি নয়। তাই মনে হয় যুক্তির পাল্লা এক্ষেত্রে 'কোটাল'কে ছেড়ে 'কোটের' দিকেই ঝুঁকে রয়েছে।

নাম নিয়ে তর্কাতর্কি ছেড়ে এখন আমরা কোটালিপাড়া পরগণার ইতিকথার আলোচনা শুরু করতে পারি। যোগেশবাবুর মুখে আমরা কোটালিপাড়া তথা উনশিয়া গ্রামের কথা শুনে বুঝেছি যে অঞ্চলটা একটা নাবাল জলাভূমি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'বৈদিক-কুল-পঞ্জিকা'তে কোটালিপাড়ার একটা সুন্দর ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "তাঁহারা বাসস্থানের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া কোটালিপাড়ায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এই স্থানটা অতি রমণীয়, বহুশস্যযুক্ত, ফলভরে অবনত পাদপরাজি বিরাজিত। সেখানে বানর, মহিষ, শূকর, ভল্লুক ও বাঘের উপদ্রব নাই। চোর ডাকাতের ভয় নাই, ত্যাগী ও মনীষী মানবগণের আশ্রয়-ভূমি। যে দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ঘর্ঘর নদ প্রবাহিত হইতেছে, যে নদকে কোন কোন পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকেন। তাহার পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ ভূমিতে তাঁহারা উৎসাহের সহিত নয়খানি পর্ণনির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকে ভল্লাতক, আম্রাতক, বিল্ব, বারুণ, প্লক্ষ, ধাত্রী, কদম্ব, হিজ্জল, অশোক, আম্র, জম্বু, কিংশুক প্রভৃতি গ্রাম্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছিল।

সেই দেশ বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, গমনাগমনের পথে প্রচুর জল হয়। ইহা দেখিয়া, তাঁহারা একস্থানে হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য কদলীবৃক্ষের দ্বারা ছোট ও বড় নানাপ্রকার ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা বাঁশ, বেত, মুঞ্জা, কন্দুল ও কাশ দ্বারা অতি দৃঢ় গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিলেন।" *

কোটালিপাড়া তখনও 'জলমগ্ন' অঞ্চল। 'ত্যাগী ও মনীষী মানবগণের আশ্রয়-ভূমি' বলে কোটালিপাড়া তখনই কীর্তিত। কিন্তু ত্যাগী ও মনীষী মহাপুরুষেরা কোথা থেকে কেনই বা এসে এই জলবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় কোটালিপাড়াতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ? বাসস্থানের সন্ধানে যাঁরা ব্যাকুলচিত্তে কোটালিপাড়ায় এসে হাজির হলেন তাঁরাই বা কারা ? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর

ইতিহাস'এ প্রথম প্রশ্নটীর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—“রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটী শ্রেণী—বৈদিক—বোধহয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলজী গ্রন্থমালায় এ সম্বন্ধে দুইটী কাহিনী আছে; একটী কাহিনীর মতে, বাংলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় রাজা শ্যামল বর্মা (বোধহয় বর্মণরাজ সামল বর্মা) কান্যকুব্জ (কোনও কোনও গ্রন্থমতে বারাণসী) হইতে ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনীমতে, সরস্বতী-নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবনাক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন. এবং বর্মণরাজ হরিবর্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তরভারত হইতে আগত এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্ত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এই কুলজী-কাহিনীর মূল বোধহয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। হলায়ুধ বলিতেছেন, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি পদ্ধতি জানিত না। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবী করিলেও যথার্থত বেদচর্চার প্রচলন বোধহয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না।”* কাহিনী দুটীর মধ্যে কোনটী সত্য সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নেই। তবে এইটুকু আমরা বোধহয় ধরে নিতে পারি যে, যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরা একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে কোটালিপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের সুযোগ্য বংশধরদেরই কুলপঞ্জিকাকার ‘ত্যাগী ও মনীষী’ বলে বিশেষিত করেছেন। আমরা আরও জানতে পারি যে এই ‘ত্যাগী ও মনীষী মানবগণের আশ্রয়ভূমি’তে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে এসে ঘর বেঁধেছেন। কুলপঞ্জিকাকার এই ধরণের কয়েকজন আশ্রয়সন্ধানী ব্রাহ্মণদেরই বর্ণনা ও বিবরণ রেখে গেছেন আগের ঐ উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন কিন্তু না উঠে পারে না। কোটালিপাড়ার এই বিস্তৃত জলমগ্ন ও দুর্গম অঞ্চলে এমন একটী বিশাল দুর্গ গড়া হয়েছিল কি কারণে? এই প্রশ্নটীর একটি মোটামুটি জবাব রেখে গেছেন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী। তিনি বলেছেন—

“…বর্ত্তমানে কোটালিপাড়া বহু মাইল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত; কিন্তু ইহা চিন্তা করা যায় না যে, একজন স্থিরমস্তিষ্ক মানুষ এইরূপ স্থানে রাজপ্রাসাদ

নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিবেন। কিন্তু এই বৃহদাকার দুর্গটী সেখানে রহিয়াছে এবং এই জলাভূমিতে প্রায়ই ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যাইতেছে। Pargiter এবং অন্যান্যেরা অনুমান করিতেছেন—এই নিম্ন জলাভূমি ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের সময় সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বকালে একটী নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু ইহা তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় না।…" *

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কিন্তু ভাগীরথী ও পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙাগড়ার ইতিহাসের মধ্যে আমাদের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"ভাগীরথী পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমতটীয় ভূভাগে অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি—খাড়ি কাকে লইয়া কী তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ডহারবারের সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশপরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ সম্পদ, কখনও গভীর অরণ্য বা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি—খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে নব্যাবকাশিকা (নবসৃষ্টভূমি) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ-শতকে নব্যাবকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্নজলাভূমি।"† এই দুইটী মতের মধ্যে কোনটী বেশী যুক্তিযুক্ত সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নেই। আমরা শুধু জেনে রাখলাম যে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি বলে পরিচিত হবার অনেক আগে কোটালিপাড়া অঞ্চলটী ছিল একটী শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর। পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণই হোক বা নদ-নদীর ভাঙা-গড়ার খেয়ালের ফলেই হোক কোটালিপাড়া নাবাল জলাভূমিতে পরিণত হয়। যে কোট বা দুর্গের স্মৃতি আজও এই প্রাচীন পরগণাটী নিজের নামের মধ্যে বহন করে চলেছে, সেটী স্পষ্টতঃই সামরিক প্রয়োজনে নির্ম্মিত হয়েছিল তার সমৃদ্ধির শুভদিনে। এই দুর্গটীর নাম ও নির্ম্মাণকাল সম্পর্কে ডঃ রায় বলেছেন—"বস্তুত প্রাচীন বাংলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেকটী নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত

স্থল-ও-জলপথের সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ইহা একেবারে অকারণ বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না।

ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটী লিপিতে চন্দ্রবর্ম্মণ-কোট বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে: সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিতে এবং এই স্থানে প্রাপ্ত সম-সাময়িক অন্যান্য লিপিতে স্থানটী নৌ-বাণিজ্য-প্রধান ছিল তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কোট হইতেই বর্ত্তমান কোটালিপাড়া নামের উদ্ভব, এরূপ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়।"* ডঃ ভট্টশালীও মনে করেন যে চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশে এসে এই দুর্গনির্ম্মাণের কাজ সুরু করেন মোটমুটি ৩১৫ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর সমৃদ্ধিময় কোটালিপাড়ার সৌভাগ্যশশীও একদিন চলে যায় অস্তাচলে। আবার ভিন্ন দিগন্তে ফুটে ওঠে চিরায়ত ঐশ্বর্য্যের রক্তিম আশ্বাস। এগিয়ে আসে নতুন গৌরব রবির অভ্যুদয়ের পুণ্যলগ্ন; উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কোটালিপাড়ার জলমগ্ন অঞ্চল, সারা বঙ্গদেশ, তথা সসাগরা ভারতবর্ষ।

॥ দুই ॥

দুর্গ-নগর কোটালিপাড়া কালে নাবাল জলাভূমিতে রূপান্তরিত হ'ল; সুরু হ'ল তার দ্বিতীয় পর্ব্ব। কান্যকুব্জ, বারাণসী অথবা সরস্বতীর তীর থেকে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা এসে এখানে বসতি স্থাপন করে দ্বিতীয় পর্ব্বের শুভসূচনা করলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই কোটালিপাড়া অঞ্চল ত্যাগী ও মনীষী-মানবগণের আশ্রয়-ভূমি বলে পরিচিত। এই সব ত্যাগী ও মনীষীগণের সাধনার ও আরাধনার পুণ্যফলেই যেন আচার্য্য ব্রহ্মচারী প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্য ব্রাহ্মণ বহুস কোটালিপাড়ায় এলেন। কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামটী তাঁর ভাল লাগল। সেখানেই তিনি শান্তির নীড় বেঁধে থেকে গেলেন। ইনিই আমাদের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের বংশের আদিপুরুষ ও কোটালিপাড়ার প্রবাদ পুরুষ। পণ্ডিতপ্রবরদের প্রচেষ্টায় পুরন্দরাচার্য্যের আদি ও উত্তরপুরুষদের নাম ধাম আমরা জানতে পেরেছি। শাস্ত্রবিৎ সদাচারসম্পন্ন অনেক ব্রাহ্মণই তাঁর বংশে জন্মেছেন। তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের জীবন কাহিনীই আমাদের এখানে আলেচনার মূল বিষয়বস্তু। তাই পরিশিষ্টে কেবলমাত্র তাঁরই

প্রত্যক্ষ পূর্ব্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীগণের নাম পুরুষদের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। শেষ দুই-পুরুষের পুত্রদের সঙ্গে কন্যাদের নামও যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট হল।

আচার্য্য-ব্রহ্মাচারী প্রমোদন-পুরন্দরাচার্য্যের আবির্ভাবের সন তারিখ আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মশায় তাঁর 'কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর' গ্রন্থে নানা দিক থেকে বিচার করে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দকে পুরন্দরাচার্য্যের আবির্ভাব কাল বলে ধরেছেন। শ্রীশঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' (২য় খণ্ড) গ্রন্থেও এই সিদ্ধান্তের মোটামুটি সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীযুত রায়ের কাহিনীমতে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে আচার্য্যদেব বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় পাদের শেষাশেষি ধরে হিসেব করলে সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের মতে আচার্য্যদেবের বয়স তখন হয় প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কাজেই এখানে শ্রীযুত রায়ের মতের সঙ্গে খুব একটা কিছু গরমিল নেই সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের গণনার। শ্রীযুত রায় ঐ প্রবন্ধেরই শেষে লিখেছেন—"আনুমানিক ১৬৩২ সালের কথা। মধুসূদনের বয়স তখন ১০৭ বৎসর।" হিসেবমত মধুসূদনের জন্ম তাহলে আনুমানিক ১৫২৫ সালে (১৬৩২—১০৭=১৫২৫)। সিদ্ধান্তবাগীশ ! মশায়ের গণনামতে পুরন্দরাচার্য্যের বয়স তখন দাঁড়ায় ৩৭ বৎসর (১৫২৫—১৪৮৮=৩৭)। এ পর্য্যন্ত দুদিক থেকেই অঙ্কটি বেশ মিলে যায়। কিন্তু অল্প স্বল্প গোলমালও যে একটু না বাধে তা নয়। শ্রীযুত রায়ের ঐ প্রবন্ধেই আমরা জানতে পারি যে পুরন্দরাচার্য্য যখন ফলকর নিয়ে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় হাজির হলেন তখন তাঁর অসাধারণ প্রতিভাধর পুত্র মধুসূদনের বয়স সবেমাত্র ১২ বৎসর। অঙ্কের নিয়মে আচার্য্যদেবের বয়স তখন হয় মাত্র ৪৯ বৎসর (৩৭+১২=৪৯)। কিন্তু শ্রীযুত রায়ের মতে তখনি যে তিনি 'বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন'। তাই ১০।১৫বছরের হেরফের মেনে নিলেই, গোলমাল মিটে যায়।

পুরন্দরাচার্য্য ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্যের অক্ষয় ভাণ্ডার সাথে করে এনেছিলেন উনশিয়ায়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অগ্নিহোত্রী শ্রীরাম মিত্রের জ্ঞান ও গরিমার কাহিনী তখনকার কুলসংহিতায় বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য কুলসংহিতায় লক্ষ্মণ বাচস্পতি লিখেছেন—

"অশেষ ষড়্দর্শন-দর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃত-মূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কশ্যপবংশ-দীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্যবিপ্রঃ॥"

শোনা যায় যে তিনি কান্যকুব্জ থেকে এসেছিলেন। প্রথমে কিছুদিন নবদ্বীপে

ছিলেন ; তারপর নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়েই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। পুরন্দরাচার্য্যের অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে সাধারণভাবে তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি আছে। পুরন্দরাচার্য্য যে নবদ্বীপ থেকেই কোটালিপাড়াতে এসেছিলেন এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে পাওয়া যায়—

“ততো নবদ্বীপনিবাসতো দ্বিজঃ পুরন্দরাচার্য্য-সমাখ্যকাশ্যপঃ।
কোটালীপাটে—শুনকাবলম্বিতে আগত্য তস্থৌ—বিনয়ী প্রিয়ম্বদঃ॥”

কেবল বিনয়ী ও প্রিয়বাদীই নয়, পুরন্দরাচার্য্য ছিলেন বহুগুণান্বিত বিরাট পুরুষ। তাঁর নাম ও উপাধির মধ্যে কিছু কিছু গুণের আভাস ও ইঙ্গিত থেকে গেছে। প্রধান অধ্যাপক ও ধর্ম্মোপদেশক হিসেবেই তিনি ‘আচার্য্য’নামে খ্যাত ; গৃহস্থ হয়েও জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি ‘ব্রহ্মচারী’ ; এবং সর্ব্বসাধারণকে আনন্দিত করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ‘প্রমোদন’। এই হ’ল ‘আচার্য্য ব্রহ্মচারী প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্য’ নামের তাৎপর্য্য ও ইতিহাস। অশেষ গুণসম্পন্ন এই মনীষীর নামকে আশ্রয় করে একটী অদ্ভুত কিংবদন্তী চালু আছে। তিনি নাকি একটা প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়েছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাতে জল ওঠে নি। দেবদেবীর অর্চ্চনা, বরুণমন্ত্র জপ ইত্যাদি সব কিছুই বিফল হ’ল। দীঘিতে জলোচ্ছ্বাসের কোনো আভাসও দেখা গেল না। পরে একদিন আচার্য্যের প্রতি স্বপ্নাদেশ হ’ল —‘তোমার কোনো ছেলে যদি ঘোড়ায় চড়ে দীঘির মধ্যে প্রবেশ করে তবেই জল উঠবে।’ তিনি এ স্বপ্নবৃত্তান্ত ছেলেদের কাছে বললেন। তাঁর ছোট ছেলেটী সাগ্রহে স্বপ্নাদেশ পালনে ব্রতী হ’ল। একটা ঘোড়া যোগাড় করে তার পিঠে চড়ে সে দীঘির মধ্যে এগিয়ে গেল। সাথে সাথে কোথা থেকে যেন কূলহারা জলধারা এসে ভরিয়ে দিল ঐ দীঘি এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল ছেলেটীকে। বহুচেষ্টাতেও তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। দীঘি ভরে উঠল জলে, কিন্তু কাশ্যপপাড়া জুড়ে নামল শোকের কালো মেঘ। তারপর কতদিন চলে গেছে। কিন্তু সেই দীঘিটী আজও সেদিনের স্মৃতিকে সাদরে ধরে রেখেছে তার ‘পুরন্দরের দীঘি’ এই—নামটীর মধ্যে। পুরন্দারাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ সাধকও ছিলেন। তিনি এক গভীর বনে কালী মাতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই বিগ্রহটীকে আজও লোকে পুরন্দরের কালী বলে থাকে।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পুরন্দরাচার্য্যের কবিযশ রাজধানী সুদূর কচুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এলে রাজসভায় আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যেত। বছরে একবার তিনি এক

নৌকো ফলকর জমা দিতে যেতেন রাজধানীতে। রাজা কন্দর্পনারায়ণ বৃদ্ধ আচার্য্যদেবের পথশ্রমের কথা শুনেও নাকি বলেছিলেন "—যতদিন একেবারে অশক্ত না হইবেন দয়া করিয়া দর্শনদানে আমাদের বঞ্চিত করিবেন না।"[১] কবিজনের সঙ্গ, সব দেশে সব কালের রসিকেরা কামনা করে থাকেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণও বছরে একবার অন্তত আচার্য্যদেবের সঙ্গ পাবার লোভে তাঁকে সদরে এসে ফলকর জমা দেবার দায় থেকে অব্যাহিত দিলেন না। একবার বার বছরের ছেলে মধুসূদনকে সঙ্গে করে আচার্য্যদেব এলেন রাজসভায়। কিশোর পুত্রের অসামান্য প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত করে দেবার চেষ্টা করলেন কন্দর্পনারায়ণের। রাজা কিন্তু তখন রাজ্যের ও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন। উদ্বিগ্ন রাজার অন্যমনস্কতাকে আচার্য্যদেব উদাসীনতা ও অশ্রদ্ধা মনে করে ক্ষুব্ধ হলেন। আর তেজস্বী মধুসূদন ঐ বয়সেই বুঝলেন যে রাজসেবায় কোনো মর্য্যাদা নেই এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে এখন থেকে ভজনা করবেন একমাত্র সেই রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরকে। পরম শুভক্ষণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেদিনের সেই ক্রুদ্ধ কিশোর আজ তাই ভারত বন্দিত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অদ্বৈত বেদান্তাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী। তাঁর পুণ্যকাহিনী সুরু করার আগে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের লেখা থেকে একটী শ্লোক উদ্ধার করে পুরন্দরাচার্য্যের পবিত্র প্রসঙ্গ শেষ করি—

"জ্ঞান প্রবীণঃ পরমার্থবেত্তা শিষ্য-প্রশিষ্যৈঃ সমুপস্যমানঃ।
গ্রন্থাননেকান্ বিরচয্য কালে স যোগযুগ্ ব্রহ্মণি সংবিলিল্যে ॥"[২]

মধুসূদন সরস্বতীর মহামহিমার আলোচনা করার বিন্দুমাত্র অধিকার আমার নেই সে কথা না বললেও চলে। তবে প্রধানতঃ তাঁর নামকীর্ত্তনের পুণ্যলোভেই দু'চার কথা নিবেদন করতে সাহসী হয়েছি। তাছাড়া হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের প্রজ্ঞা ও প্রেরণার উৎস সন্ধানে আমাদের ত যেতেই হবে তাঁর বংশের আদিপুরুষদের কাছে তাঁর জন্মভূমি কোটালিপাড়ায়। মধুসূদন পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় (মতভেদে চতুর্থ) পুত্র। তাঁর আবির্ভাব কাল নিশ্চিতভাবে জানার আজ আর বোধহয় কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো ঠিকুজী, কোষ্ঠী বা জীবনচরিত পাওয়া যায় নি। তাঁর গ্রন্থগুলিতেও জন্মের সন তারিখের কোনো হদিস পণ্ডিতেরা পান নি। সবদিক বিবেচনা করে পণ্ডিতেরা অবশ্য মনে করেন

যে ১৫২৫ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে—

"পুণ্যতীর্থে কৃতং তেন তপঃ ক্বাপ্যতি দুষ্করং।
তস্য পুত্র ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ ॥"

অর্থাৎ ;—"যিনি কোনও পুণ্যতীর্থে অতিশয় দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নিশ্চয়ই বশীভূত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়।"[3] মহামতি শ্রীরামমিশ্রের বংশধরেরা বারে বারে এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু 'বশ্যঃ' অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে 'বশীভূত' কি তাঁরা সবাই ছিলেন? পিতার বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সব সংস্কার ও অনুশাসন এবং শাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তেরই কি তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন? মধুসূদন অন্তত তা পারেন নি। ভারতের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে ভারতবাসীর অধ্যাত্মচেতনাকে গ্লানিমুক্ত করতে যুগে যুগে যাঁরা এসেছেন, মধুসূদন তাঁদেরই গোষ্ঠীভুক্ত একজন মহাপুরুষ। তিনি বরং সার্থক করেছেন উপনিষদের ঋষির প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী, 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'[4]—'হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও'।[5] সেই প্রাণের পাঞ্চজন্যের আহ্বানেই তিনি কিশোর বয়সে পথে বেরিয়ে পড়লেন। শিশুকালেই তাঁর প্রতিভা ও অসাধারণতার পরিচয় পেয়েছিলেন পিতা পণ্ডিত-ধুরন্ধর পুরন্দরাচার্য্য। তাই তিনি 'ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে' এই শাস্ত্রাদেশ অনুসারে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই মধুসূদনের উপনয়নের ব্যবস্থা করেন। কৈশোরেই তাঁর সহজাত জ্ঞান কোটালিপাড়ার বিবুধমণ্ডলীকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছিল। কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাসকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করে তিনি চললেন পরমার্থের সন্ধানে। ভরসা কেবল মনোবল ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। গন্তব্যস্থল তাঁর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ। নবদ্বীপের আচার্য্যমণ্ডলী এই বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন কিশোরকে সানন্দে গ্রহণ করলেন ও শিক্ষা দিলেন। মধুসূদন আশ্চর্য্য দ্রুততার সঙ্গে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রামাণ্য ন্যায়গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' অধিগত করলেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের চেয়ে তাঁর মনকে অনেক বেশী প্রভাবিত করে নবদ্বীপের ভক্তিরসস্নিগ্ধ পরিবেশ। তাঁর মনের গহনে সুরু হয়ে যায় ভাঙা-গড়ার পালা। পালাশেষে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর মনের মর্মকোষে অক্ষয় রেখায় মুদ্রিত হয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণের

রসোজ্জ্বল মূর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মধুময় বাণী। মহাপ্রভুর মাধুর্য্যময় দ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল তখন তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সে কাজ বড় সহজ নয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রখর প্রভায় ভারতবর্ষ ভাস্বর। সেই অদ্বৈতবাদের অপরূপ যুক্তিব্যূহ ভেদ করতে হলে প্রথমে অদ্বৈতবাদই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা দরকার। বারাণসী তখন বেদান্তবিদ্যার সাধনকেন্দ্র। কিন্তু সে দেশ যে অনেকদূর, পথে বিপদও পদে পদে। কিন্তু তরুণ ব্রহ্মচারী বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম্ করে বারাণসীতে এসে হাজির হলেন—'শরীরবন্ধঃ প্রথম আশ্রমো যথা।'

বেদান্তকেশরী রামতীর্থের তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। লোকোত্তর প্রতিভা ও অমানুষিক সাধনার ফলে অল্প সময়েই বেদান্তবিদ্যা তাঁর অধিগত হ'ল। পরে মীমাংসা শাস্ত্রও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু বেদান্ত সাধনার ফলে ভক্তিবাদী মধুসূদনের অন্তরসত্তা নূতন উপলব্ধির আলোকে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হ'ল। আকৈশোর লালিত ভক্তিবাদের নতুন দিগন্ত আভাসিত হ'ল আর অদ্বৈতবাদের মর্ম্মকথা প্রতিভাত হ'ল তাঁর মানসপটে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে পূর্ণ অভেদ-জ্ঞানেই পূর্ণভক্তি। ভগবানকে সবার ও নিজের অন্তরাত্মা এবং সবের সবকিছু বলে জানতে পারলে তবেই না পূর্ণভক্তি, প্রেম ও প্রকৃত আত্মসমর্পণ সম্ভব! এই পরম উপলব্ধির ফলশ্রুতি হ'ল তাঁর অমর কীর্তি—'অদ্বৈতসিদ্ধি'। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র মত মহাগ্রন্থের আলোচনা উপযুক্ত পণ্ডিতেরা করেছেন ও করবেন। শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মশায় লিখেছেন—"অদ্বৈতসিদ্ধি প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় স্থির, ধীর ও গম্ভীর। ইহাতে প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণে কার্পণ্য নাই, উদ্বেল তরঙ্গমালা নাই। ইহা উদারতাপূর্ণ।…অনাদিকাল হইতে দ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় যুক্তিতর্ক, অনাদিকাল হইতে অদ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় মতবাদ ইহাতে একাধারে বর্ত্তমান। ইহার পরে, ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহা কেবল এই অদ্বৈতসিদ্ধির অংশ বিশেষ, টীকা টিপ্পনী ও তাহার খণ্ডন মণ্ডন লইয়া।"[৬] মধুসূদনের গীতার সুবিখ্যাত টীকা 'গূঢ়ার্থদীপিকা' মূলতঃ শাঙ্করভাষ্য অনুসারী। কিন্তু তার ছত্রে ছত্রে রয়েছে মধুসূদনেরও সাধনার স্বাক্ষর। গঙ্গা যমুনার মতো তাঁর জ্ঞান ও ভক্তির ধারা মিলেছে গীতাতীর্থে। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপস্যাবলে পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্ত হলেন। 'তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং নন্দনন্দনম্' 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি

তত্ত্বমহং ন জানে'—এ সব শ্লোকাংশ থেকে বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর 'উপাস্য পরমতত্ত্ব'। তাই তাঁর সাকার কৃষ্ণের সাধনাও অদ্বৈতবিরোধী নয়।

মধুসূদনের সঙ্গে সন্ত তুলসীদাসের ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। অদ্বৈতবাদী হয়েও তুলসীদাসের কবিতামঞ্জরীকে 'রামভ্রমরচুম্বিতা' বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন। আনুমানিক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১০৭ বছর বয়সে হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে মধুসূদন সমাধিমগ্ন হলেন। এই সমাধিই তাঁর চিরসমাধি। ঘট ভাঙল, ঘটাকাশ ও মহাকাশে একাকার হয়ে গেল। এখন তাঁর সম্পর্কে রচিত প্রশস্তি শ্লোকটী আবৃত্তি করে আমরা এ পুণ্য প্রসঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারি—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥"

অর্থাৎ সরস্বতীর পার বা সীমা মধুসূদন জানেন আর মধুসূদনের পার জানেন শুধু দেবী সরস্বতী।

যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য পুরন্দরাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার বংশধারাই ন্যায়াচার্য্যের ধারা বলে খ্যাত। এই বংশেরই উত্তরপুরুষ হলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। অসামান্য কীর্তিমান মধুসূদন সরস্বতীর পাশে স্বভাবতই যাদবানন্দকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখায়। নিজের ক্ষেত্রে যাদবানন্দও কিন্তু যথেষ্ট যশস্বী ছিলেন। নবদ্বীপে সুনামের সঙ্গে লেখাপড়া শেষ করে তিনি 'ন্যায়াচার্য্য' উপাধি পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তখন নবদ্বীপের ন্যায়ের উপাধি ছিল বিশেষ গৌরবেব ও মর্য্যাদার। তাঁর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। তাঁর ফুলের বাগান থেকে ছোট একটী মেয়ে রোজ ফুল তুলে নিয়ে যেত। মেয়েটী তাঁকে ঠাকুর্দা বলেই ডাকত। একদিন তিনি মেয়েটীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"তুই যদি আবার ফুল নিতে আসিস্, তাহলে তোকে আমি বিয়ে করে ফেলব।" কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। তাছাড়া যাদবানন্দের মতো সদ্বংশজাত সুপাত্র মেলাও ত সহজ নয়। তাই মেয়ের বাবা একদিন স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে 'ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥' এই শাস্ত্র বাক্য তুলে যাদবানন্দের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। মেয়ের বাবা ঘর ও কুলমর্য্যাদায় ছোট ছিলেন। কিন্তু যাদবানন্দ নিজের কথার নড়চড় করলেন না। তাঁর বড় ভাই আচার্য্য চূড়ামণি এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। সময়ের গুণে পরে অবশ্য সবই ঠিক হয়ে গেছে; চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্যের বংশধরদের মধ্যে সদ্ভাবও ফিরে এসেছে। যাদবানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও কবিত্বশক্তি সম্পর্কেও একটী কিংবদন্তী আছে। একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের

সঙ্গে যাদবানন্দ বিচারে বসেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। তাই পণ্ডিত তাঁর অল্প বয়সের কথা নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। যাদবানন্দ সঙ্গে সঙ্গে হেসে জবাব দিয়েছিলেন—

> "বালোহং যাদবানন্দ ন মে বালা সরস্বতী।
> বাল-বালস্ত গরলং ন দহেৎ কিং শরীরিণম্॥"

অর্থাৎ আমি যাদবানন্দ যে বালক একথা সত্য; কিন্তু আমার বাণী বালিকা নয়। ছোট সাপে কামড়ালে কি শরীর বিষের জ্বালায় জলে পুড়ে যায় না!

যাদবানন্দের গুণসম্পন্ন ছটী ছেলে। দ্বিতীয় হলেন গৌরীদাস ন্যায় পঞ্চানন। তিনি অশেষ শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। তাঁকে 'যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপ বংশাবলী'তে 'স্ফুরদবিরত সর্ব্বগ্রন্থ-সিদ্ধান্তসারঃ' বলে বিশেষিত করা হয়েছে—অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত তাঁর অধিগত ছিল। তাঁর পুত্র স্মার্তাগ্নিহোত্রী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও তস্য পুত্র বলরাম তর্কভূষণ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বলরাম তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং বহুগ্রন্থপ্রণেতা। তার পুত্র রুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌম এবং সার্ব্বভৌমের পুত্র গৌরীনাথ বিদ্যারত্নের জীবন কথাও আমাদের জানা নেই। বিদ্যারত্নের পুত্র রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত ব্যাকরণ, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। নিজের গ্রামে একটী টোল খুলে ইনি অধ্যাপনা করতেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এনার মৃত্যু হয়। তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র কাশীচন্দ্র বাচস্পতি আমাদের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের পিতামহ। ইনি ১২২৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ বৈয়াকরণিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বলে প্রসিদ্ধ। কথকথাতেও তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি নিজের গ্রামে ও নিজের বাড়ীতে টোল খুলে অধ্যাপনা করেন। মাঝে মাঝে বরিশাল, ঢাকা ফরিদপুর ইত্যাদি জেলার নানা জায়গা থেকে তাঁর রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং পুরাণপাঠের আমন্ত্রণ আসত। এত কাজের পরেও তিনি সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ তুলট কাগজে নিজের হাতে লিখে রেখে যাবার সময় যে কি করে পেলেন তা আমরা ভেবে কিছু কূলকিনারা করতে পারি না। সব কাজ ফেলে কেবল রামায়ণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি বেছে পুঁথির পাতায় সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হলে অনেক অক্লান্ত কর্মী পুরুষই হয়ত রণে ভঙ্গ দেবেন। আর সে লেখাও কিছু যেমন তেমন ব্যাপার নয়। কতদিন ত কেটে গেছে, কিন্তু তুলট কাগজে লেখা কালো কালো সেই গোটা গোটা

অক্ষরগুলি আজও জ্বলজ্বল করছে। হাতের লেখার শ্রী এবং সৌন্দর্য্যও অনবদ্য। পড়তে পড়তে চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে এক সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বশালী ও ধৃতচিত্ত পণ্ডিতের ছবি। আপনারা দেখে আনন্দ পাবেন ভেবে পুঁথির একটী পাতার প্রতিলিপি দিয়ে দেওয়া হয়েছে (মহাভারতম্‌-এর প্রথম পাতায়)। বাচস্পতি-মশায়ের এই কঠিন পরিশ্রম অবশ্য মোটেই বিফলে যায় নি। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর পিতামহের লেখা মহাভারতের এই পুঁথিটিকেই পাঠান্তরের দুস্তর পারাবারের দিশারী হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বাচস্পতি মশায়, পরিণত বয়সে ১৩০৫ সালের ১১ই ভাদ্র পরলোক গমন করেন। হরিদাসের পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কারের জন্ম ১২৫৯ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ। ইনি কাশীচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্যাকরণ থেকে সুরু করে পুরাণ ও তন্ত্রের পাঠ ইনি পিতার কাছেই নিয়েছিলেন। সংস্কৃতে কবিতা রচনাতেও তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পাঠ শুনে (কোটালিপাড়ার) পশ্চিম পাড়ের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে অবশ্য তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই বংশে তিনিই বোধহয় প্রথম শিক্ষার্থে কলকাতায় আসেন এবং অসাধারণ জ্যোতিষী কালীচরণ আচার্য্যের কাছে পড়াশোনা করেন। পরে উনশিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি রতাল গ্রামের নাম করা জ্যোতিষী হলধর গৌতমের কাছে ফলিত জ্যোতিষে শিক্ষা নেন। ফলে প্রশ্ন গণনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর কবিত্বশক্তির মত, জ্যোতিষশাস্ত্রে এই জ্ঞান ও দক্ষতা পুত্র হরিদাসের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তারপর তিনি নিজের বাড়ীতে পিতার টোলে অধ্যাপনা সুরু করেন। জীবনের শেষ দিকে অবশ্য অসুস্থতার দরুন তিনি আর অধ্যাপনা করতে পারেন নি। ১৩২৮ সালে তিনি নিজের গ্রামেই দেহত্যাগ করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের জন্ম এই কীর্তিত কাশ্যপবংশে। আদি-পুরুষদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির; এষণা ও কাব্যপ্রেরণার বিরাট উত্তরাধিকার সাথে নিয়েই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর সেই পবিত্র উত্তরাধিকারকে তিনি সর্ব্বাংশে সার্থক করেছিলেন তাঁর অনন্যসাধারণ সাধনায়।

॥ তিন ॥

হরিদাসের জন্ম ধনুরাশিতে এবং তুলালগ্নে। কিন্তু যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁরা হয়ত এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চাইতে পারেন। হরি-

দাসের কর্ম ও কীর্তির সঙ্গে শাস্ত্রগত সিদ্ধান্ত মিলিয়ে দেখবার উৎসাহও তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে এ বিষয়ে যা কিছু লেখা আছে তা তুলে দিলাম—

মেষ।—

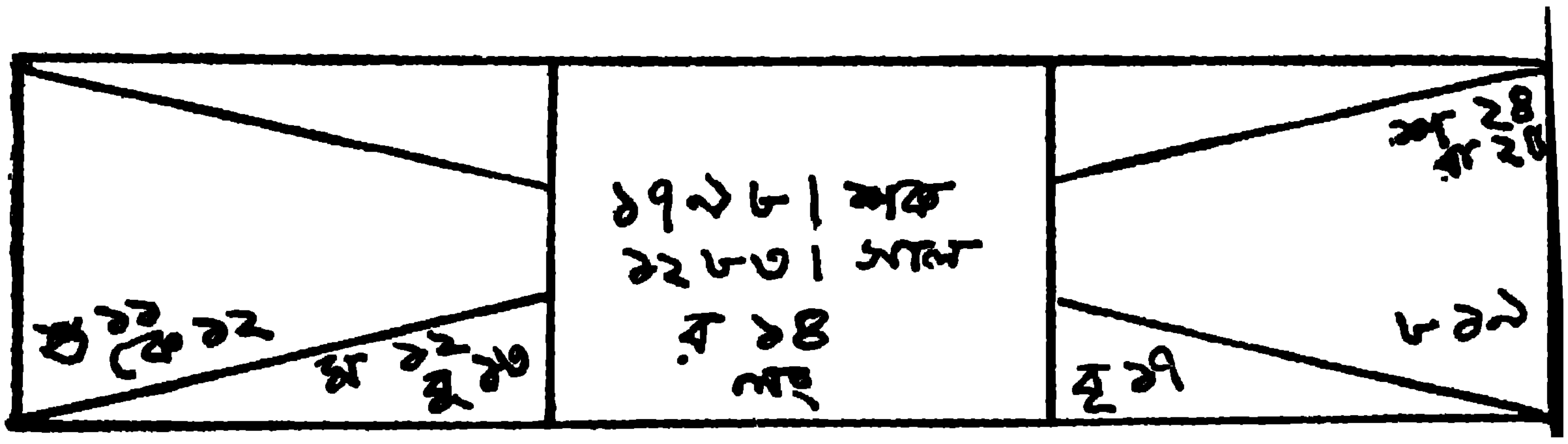
১৭৯৮। শক
১২৮৩। সাল
র ১৪
লগ্ন
শু ১১ কে ১২
ম ১২ বু ১৩
শ ২৪ রা ২৫
৮।১৯
বৃ ২৭

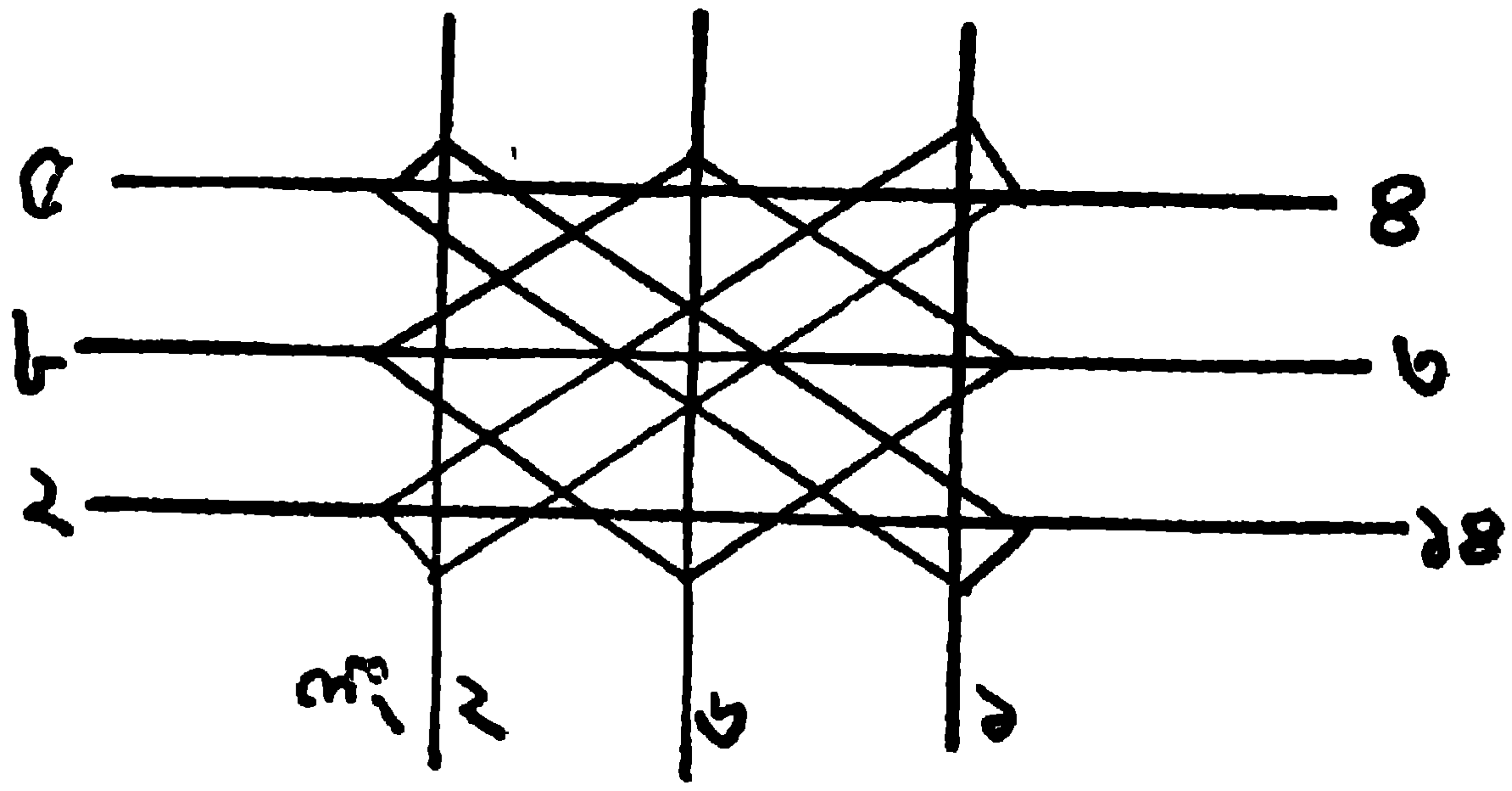
৫
৮
২
৪
৬
১৪
লগ্ন
২
৬
১

পতাক্যভাবঃ

জাতাহঃ

	১	১৯	৬
	৫	৬০	৫৮
	৩২	০	১
	১	২	৭
র	১৫	দ	৫
	২৮	|	২১

পরাহঃ

২	১৯	৭
৬	২	৫৯
৩৬	৩৭	১৩
৫৩	৩	৮
২৮	|	২৩

‘যদ্‌গোত্রে ভবিতা কথা সুকবিতা’—যে গোত্রে কথাই সুকবিতা, সেখানে সব শিশুই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস নিয়ে আসে। তাই শিশু হরিদাসের মধ্যে বোধ হয় কেউ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নি। করে থাকলেও আজ আর সে সব কথা জানার কোনও উপায় নেই। সেকালের প্রথামত পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতে-খড়ি

হয় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মশায়ের কাছে। তারপর যথারীতি পাঁচ বছর পাঠশালায় তিনি বাংলা শেখেন। এর মাঝে যখন তাঁর বয়স সাত বছর তখন তিনি দারুণ কলেরার কবলে পড়েন। এগার বছর বয়সে পিতামহের কাছেই তাঁর ব্যাকরণ পাঠ শুরু হল। আমাদের সময়েও প্রায় ঐ রকম বয়সেই স্কুলে দেবভাষার সঙ্গে পরিচয় হ'ত—'নরঃ নরৌ নরাঃ'-র বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে। কিন্তু এ অন্য ব্যাপার। শুরুতেই 'কলাপ' বা 'মুগ্ধবোধে'র সূত্র মুখস্থ করতে হ'ত কিশোর পড়ুয়াদের। কোটালিপাড়া অঞ্চলে তখন ছিল 'কলাপে'রই প্রচলন। পিতামহের কাছে 'কলাপে'র সন্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়ে হরিদাস কোটালিপাড়ার পশ্চিমপাড়া গ্রামের ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণের কাছে চতুষ্টয়বৃত্তির নাম প্রকরণ, আখ্যাত বৃত্তি ও কৃদ্‌বৃত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ পর্য্যন্ত শেষ করেন। কারক, সমাস, তদ্ধিত, কৃদবৃত্তির বাকী অংশ ও গোটা পরিশিষ্ট তিনি অবশ্য পড়েন আবার পিতামহের কাছে, বাড়ীতে। শাস্ত্রসৌধে প্রবেশের প্রথম ধাপ হ'ল ব্যাকরণ জ্ঞান। এ ধাপ তাই সব ছাত্রকেই পেরিয়ে যেতে হয়। হরিদাসের পিতা এবং পিতামহও যথাসময়ে ব্যাকরণে বুৎপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি যে পিতামহ কাশীচন্দ্র একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পণ্ডিত্যের ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পিতা গঙ্গাধরকে একটু নিষ্প্রভ মনে হলেও, তাঁরও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরিদাস পশ্চিমপাড়ার বিদ্যাভূষণের টোলে ব্যাকরণ পড়তে গিয়েছিলেন কেন? কোন পণ্ডিত কোন বিষয়ের কোন অংশটা ভাল বোঝেন ও বোঝাতে পারেন এসব খবর পাড়ার আশেপাশের সকলেই রাখতেন। বিদ্যাভূষণ মশায় ছাত্রদের ব্যাকরণের বনিয়াদ মজবুত করে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। তাই হরিদাস তাঁর কাছেই ব্যাকরণের বেশ কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। এর ফাঁকে কিন্তু হরিদাসের জীবনে কয়েকটা বড় গোছের ঘটনা ঘটে গেছে। সেগুলির খোঁজ মেলে তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে—"...১২৯৫ সনের মাঘমাসে পিতামহ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় হইতে উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল।

১২৯৮ সনের ২৮শে শ্রাবণ গৈলানিবাসী ভরদ্বাজগোত্র শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুরের প্রথম কন্যা শ্রীমতী সরলাসুন্দরীর (৯ বর্ষীয়া বা ১০) সহিত প্রথম পরিণয় হয়।...

১২৯৯ সনের আশ্বিন মাসে পিতামহ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা হয়।..."

ছোট ছোট করে লেখা খবরগুলির ফাঁকে ফাঁকে সেকালের পল্লীর শাস্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণসমাজের একটুকরো ছবি যেন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। শ্রুতি-স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সে সমাজের প্রতিনিধির ভূমিকায় আছেন পিতা ও পিতামহ। তাঁদের ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় সবকিছুই সময় মত ঘটে চলেছে—উপনয়ন, বিবাহ, দীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি। কোথাও কোনো সংঘর্ষ নেই, এমন কি সংশয়ও নেই; আছে শুধু অটল শাস্ত্রবিশ্বাস ও নিশ্ছিদ্র শৃঙ্খলাবোধ। ১৩০০ সালের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনাটী প্রসারিত করলে আমরা দেখতে পাই যে ওপার বাংলা তখন নতুন ভাবধারায় অভিষিক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সারা দেশকে আলোকিত ও আলোড়িত করে সবে অস্ত গেছেন; রবীন্দ্রনাথও তাঁর সোনার তরী বেয়ে প্রায় মধ্যাহ্ন গগনে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু কি করে যে উনশিয়া তথা কোটালিপাড়া তাঁদের প্রভাব-বলয়ের একেবারে বাইরে থেকে গেল সে কথা আমাদের আলোচনার চোহদ্দির মধ্যে পড়ে না।

হরিদাসের ছাত্রজীবনের কথায় এবার আমরা ফিরে যেতে পারি। নিজ-প্রকাশিত 'মহাভারতের ইতিহাস'এর 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত'-এ তিনি লিখেছেন—"তখন পনর বৎসর সাত মাস বয়সে স্বগ্রামে স্থাপিত আর্য্যশিক্ষা সমিতিতে—(গ) অমরকোষ পাঠ্যযুক্ত কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হই এবং 'শব্দাচার্য্য' উপাধি ও একটী রৌপ্যপদকের মূল্যস্বরূপ ৬ টাকা লাভ করি। এই সময়ে আমি সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্য বলিতে ও লিখিতে পরিতাম এবং 'কংসবধ' নাটক ও 'শঙ্করসম্ভব' খণ্ডকাব্য রচনা করি (ঘ)। পরে আমি পিতামহদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।" 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়—জীবনী'তে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—(সাহিত্যবিনোদ—বিদ্যাবিনোদ কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-পুরাণতীর্থ) ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন—"পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় ইতি স্বগ্রামস্থিত আর্য্যশিক্ষা সমিতিতে কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া 'শব্দাচার্য্য, উপাধি এবং বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন।

এই সময় ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয় এবং অনর্গলভাবে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনার ক্ষমতা জন্মে। ১৩ বৎসর বয়সে ইতি সংস্কৃত ভাষায় 'কংসবধ' নামে একখানি নাটক রচনা করেন।"

কিন্তু হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে যে বিবরণ আমরা পাই তা একটু অন্যরকমের।

যথা—"১৩০০ সনের (১৮১৫ শাকের) বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে কোটালিপাড়া আর্য্যশিক্ষা সমিতিকেন্দ্রে প্রথম শ্রেণী (তৃতীয় বার্ষিক) পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্তি যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু স্থানীয় গোলযোগে বৃত্তি পাওয়া যায় নাই। এই পরীক্ষার প্রশংসাপত্র (সার্টিফিকেট) ১৩০০ সনের ১১ই আশ্বিন পাইয়াছি। উহাতে রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় সভাপতির স্বাক্ষর আছে এবং সম্পাদক রেবতীমোহন কাব্যরত্নের স্বাক্ষর আছে।

১৩০০ সনে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদেশানুসারে প্রথমতঃ গদ্যে, পরে স্রগ্ধরাছন্দে ২২ শ্লোকে পদ্যে, তৎপর পাঁচ সর্গাত্মক 'শঙ্করসম্ভব' খণ্ডকাব্য রচনা করা হয়।

১৩০০ সনের ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কৃদ্বৃত্তির দ্বিতীয় পর্য্যন্ত পড়িয়া বাটীতে শ্রীযুক্ত পিতামহদেবের নিকট ঐ ব্যাকরণের অবশিষ্ট পড়িতে আরম্ভ করা হয়। তখন সংস্কৃত বলা ও লেখাতে অধিকার হইয়াছে।

১৩০১ সনের (১৮১৬ শাকের) বৈশাখ মাসে কোটালিপাড়া আর্য্যশিক্ষা সমিতিকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত পিতামহদেবের নামে কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম উত্তীর্ণ হই।...

১৩০১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে পিতামহদেবের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়া সমাপ্তি করা হয়।

১৩০১ সনে তর্কালঙ্কার বাটীর লক্ষ্মীদাদা 'লক্ষ্মণাহরণ' নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া কেবল সংস্কৃত ভাষায় গদ্যপদ্যাত্মক 'কংসবধ' নাটক রচনা করা হয়।..."

পরীক্ষা দুটীর সন, তারিখ ও ফলাফল ঘটনাপঞ্জীতে যা লেখা আছে, উপাধিপত্রেও ঠিক তাই আছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আমরা এখানেই শেষ করতে পারি।

ঘটনাপঞ্জী পড়লে মনে কোনো সংশয়ই থাকে না যে 'শঙ্করসম্ভব'ই তাঁর প্রথম রচনা, 'কংসবধ' নয়। বই দুটীর কোনোটীই ছেপে বের হয়নি বটে, কিন্তু অন্য ছাপা বইতে তাদের উল্লেখ আছে। 'বিয়োগবৈভব' খণ্ডকাব্যের শেষের আগের শ্লোকে হরিদাস বলেছেন—

"আদৌ ময়া ষোড়শবর্ষবর্ত্তিনা
বিনির্ম্মিতং কংসবধাখ্যনাটকম্।
কাব্যং ততঃ শঙ্করসম্ভবং পরং
শ্রী জানকীবিক্রম নাটকং কৃতম্॥"

তাহলে কি 'কংসবধ'ই হরিদাসের প্রথম রচনা? হ্যাঁ, তাই। অনুসন্ধানের ফলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'শঙ্করসম্ভব'-এর দু'দুটী পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে যেটী বেশী পুরানো বলে মনে হয় তার সঙ্গে কোনো টীকাটিপ্পনী নেই। অন্যটীতে শ্রীতারকচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা 'শশিকলা' নামে একটী টীকাও আছে। তারকচন্দ্র বিদ্যারত্ন মশায়ের সম্পর্কে অবশ্য বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। সে যাহোক পাণ্ডুলিপি দুটীর মধ্যে বিশেষ কিছু রচনাগত গরমিল নেই। সটীক পাণ্ডুলিপিটির ১১৭ পাতার অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া হল। এর পরে আর কোনো সংশয়ই থাকার কথা নয় যে 'কংসবধ'ই হরিদাসের প্রথম রচনা। 'শঙ্করসম্ভব' লিখেছেন তিনি 'কংসবধে'র পরে—১৩০১ সনে (১৮১৬—৫১৫ = ১৩০১)।—

"বিদ্বদ্বৃন্দবিরাজিত বুধজিতে কোটালিপাড়ে সতি
তিষ্ঠন্ শ্রীহরিদাসনামক বটুর্বিদ্বন্মনোমোদনঃ।
শাকে স্কন্দমুখেন্দু নাগবিধুমে মাসে তপস্যে রবেঃ
কাব্যং শঙ্করসম্ভবং রচিতবানেষাদ্বিতীয়া কৃতিঃ॥৭২॥

ইতি শ্রীহরিদাস কৃতৌ শঙ্করসম্ভবে মহাকাব্যে প্রদীপপ্রদানো-নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।"

*

"...স্কন্দমুখেন্দু নাগবিধুমে স্কন্দস্য কার্ত্তিকেয়স্য মুখানি ষট্ ইন্দুরেকঃ নাগাশ্চাষ্টৌ বিধুশ্চন্দ্র একঃ...। ষোড়শোত্তরাষ্টাদশ শাক ইত্যর্থঃ। ইদং শঙ্করসম্ভবং কাব্যং রচিতবান্।...কংসবধং নাম নাটকং বিরচয্য ইদং রচিতবানিতি দ্বিতীয়া কৃতিরিতি—।"

"ইতি শ্রীতারকচন্দ্রবিদ্যারত্ন বিরচিতায়াং শঙ্করসম্ভব টীকায়াং শশিকলাখ্যায়াং পঞ্চমঃ সর্গঃ॥"

*

ঘটনাপঞ্জী ও 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত' মারফৎ আমরা সেকালের সুদূর গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অনেক কথাই জানতে পারি। প্রথম দিকে সরকারী প্রণালীবদ্ধ কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। পণ্ডিতেরা নিজেদের বাড়ীতেই

টোল গড়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। জমিদারেরাও অনেকে চতুষ্পাঠী স্থাপন করাকে পুণ্যকর্ম বলেই মনে করতেন। সক্ষম হলে পিতা ও পিতামহের কাছেও বিদ্যালাভ হ'ত। টোলের সংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না। কাজেই দূরাদূরান্ত থেকে জিজ্ঞাসু ছাত্রেরা 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' গীতার এই বাণী শিরোধার্য্য করে এসে খ্যাতিমান অধ্যাপকদের পদপ্রান্তে বসে পাঠ নিতেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার ভার ছিল অধ্যাপকদের অথবা টোলের কর্মকর্তাদের বা উদার গ্রামবাসীদের ওপর। যথাকালে ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হয়ে গুরুকে প্রণাম করে দেশে ফিরে গিয়ে অধ্যাপনাকেই জীবনের ব্রত করতেন। তাঁরা স্থির জানতেন যে অধ্যাপনা ছাড়া অধীত শাস্ত্রের ওপর অধিকার স্থায়ী হয় না। ঘটনাপঞ্জীতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দলাদলির খবরও আমরা পাই। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করতেন যে—'উপাধি ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে'। এ ব্যাপারে যথাসম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বেশ কয়েকটী পরীক্ষা-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার সারস্বত-সমাজের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল পূর্ব্ববাংলার বহু পণ্ডিতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বাংলা সরকারের সংস্কৃত পরীক্ষা-সভা ঢাকার এই সারস্বতসমাজের অনুজ। সারস্বত সমাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি পেতেন। কোটালিপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামের 'আর্য্য শিক্ষা সমিতি'ও এই ধরণের একটী স্থানীয় পরীক্ষা-সভা। উপাধিদানের অধিকার মূলতঃ এই সব পরীক্ষা-সভারই ছিল। এক কথায় এই পরীক্ষা-সভাগুলি অনেকটা গ্রামীণ বা আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই ছিল। খ্যাতকীর্তি অধ্যাপকেরাও ব্যক্তিগতভাবে উপাধিদানের অধিকার ভোগ করতেন। আবার বিচার-সভায় বা পাঠ-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিজয়ী পণ্ডিত বা কৃতী পাঠককে উপাধি দান করতে পারতেন। তবে কোনো সংস্থা বা সভাই বা কোনো অধ্যাপক সরকারের দেয় কোনো উপাধি (যথা কাব্যতীর্থ ইত্যাদি) কোনো পণ্ডিতকেই দিতে পারতেন না। পরীক্ষা-সভাগুলিতে কোনো না কোনো অধ্যাপকের নামে পরীক্ষা দিতে হ'ত। হরিদাস শ্রীব্রজকুমার বিদ্যাভূষণ এবং পিতামহ শ্রীকাশীচন্দ্র বাচস্পতির নামে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। একালেও যাঁরা ঘরে বসে পড়েন তাঁদেরও পরীক্ষা দেবার আগে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী প্রমাণপত্র দাখিল করতে হয়। তাছাড়া অধ্যাপকের নামে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থার মধ্যে গুরুর প্রতি ছাত্রের আনুগত্য

ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ইঙ্গিতও থাকতে পারে। এখন আমরা হরিদাসের প্রথম জীবনের রচনাগুলির কথায় ফিরে যেতে পারি।

এ কথা তর্কাতীত যে, হরিদাস 'কংসবধ', 'শঙ্করসম্ভব', 'জানকীবিক্রম' ও 'বিয়োগবৈভব' এই চারখানি বই লেখা শেষ করেছেন ১৩০২ সালে, ('সপ্তৈকনাগেন্দুমিতে শকাব্দে') যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর ('একোনবিংশা-বয়ঃস্থিতাত্মা—')। ঘটনাপঞ্জী ও পাণ্ডুলিপি মারফৎ আমরা জেনেছি যে শঙ্করসম্ভবের কয়েকটী শ্লোক তিনি স্রগ্ধরা ছন্দে রচনা করেছিলেন। এত অল্প বয়সে স্রগ্ধরার মত অতি-গম্ভীর মেজাজের ছন্দে শ্লোক রচনা যে বিশেষ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের কথা তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। 'কংসবধ' যখন তিনি লেখেন, তখন অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর পড়া ছিল না। তাই 'কংসবধে' নাটকের লক্ষণগুলির বিশেষ সন্ধান মেলে না। এ সব কথা হরিদাস নিজেই বলে গেছেন। বছর কয়েক পরে নাটকটীকে ঘষে মেজে মঞ্চস্থ করা হয়। এ বিষয়ে ঘটনাপঞ্জীতে তিনি বলেছেন—"১৩০৩ সনে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 'কংসবধ' নাটক পুনঃ সংশোধন করিয়া মদন পাড় দেড় আনি বাটীর ক্ষীরোদ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত দেড় আনি বাটী ও সিদ্ধান্তবাটীতে অভিনয় করা হয়। অভিনয় দেশীয় ভাবে ভাল হইয়াছিল।" 'কংসবধে'র পাণ্ডুলিপি আমরা পাই নি। তাই তাঁর প্রথম রচনাটী না পড়তে পাবার ক্ষোভ আমাদের থেকেই যাবে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'শঙ্করসম্ভব' ও 'জানকীবিক্রম'এর পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। 'শঙ্করসম্ভব'এর কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। 'জানকীবিক্রমে'রও 'শঙ্করসম্ভব'এর মত দু' দুটী পাণ্ডুলিপি। যেটী সম্পূর্ণ ও সযত্নে রক্ষিত, সেটীর সঙ্গে হরিদাসেরই 'বিক্রমচন্দ্রিকা' নামে একটী টীকা আছে। অন্যটি বেশী পুরানো এবং মনে হয় অসম্পূর্ণ—সঙ্গে কোনো টীকাও নেই। পাণ্ডুলিপি দুটির মধ্যে রচনাগত গরমিলও কিছু কিছু আছে। সঙ্গে একটী ছাপা প্রোগ্রামও পাওয়া গেছে। সেটী আগাগোড়া সংস্কৃতেই লেখা। সবনীচে লেখা আছে, 'শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চতুর্ধরীণঃ,'—অর্থাৎ ক্ষীরোদ চৌধুরী যাঁর নাম আমরা আগের উদ্ধৃতিতে পেয়েছি। আঠার বছর বয়সেই ('অষ্টাদশাব্দে বির্মিতে বয়স্ত্বসৌ···) যে এই নাটকটী হরিদাস রচনা করেছিলেন সে কথা তিনি সূত্রধারের মুখেই বলেছেন। এখন আমরা সটীক পাণ্ডুলিপির ১৯০ পাতা (শেষ পাতা) থেকে কিছুটা তুলে দিলাম।—

"ভূপালাঃ পান্তু পৃথ্বীং প্রকৃতি হিতরতাঃ সন্তসন্তোহপ্যনন্তাঃ
দ্যোতন্তাং বিশ্ববিদ্যাঃ সুজনপিশুনতাং সজ্জনাবর্জ্জয়ন্তাম্ ।
অর্কঃ কালে মরীচিং বিতরতু চ যথা সন্তবাদবভ্রমন্তঃ
শস্যৈঃ স্নিগ্ধৈঃ সমৃদ্ধা ভবতু চ সুকৃত-স্রগধরেয়ং ধরাপি ॥২৪॥"

"সমাপ্তমিদং শ্রীহরিদাসশব্দাচার্য্য প্রণীতং
জানকীবিক্রম নামকং নাটকং
ওং

উত্তর কালের 'সাহিত্যদর্পণের সার্থক টীকাকার (টীকার নাম 'কুসুমপ্রতিমা' , হরিদাস 'ভাষাবিভাগে'র নিম্নলিখিত অনুশাসন মেনেই নাটকটীতে সংস্কৃত, শৌরসেনী ও পৈশাচী তিনটী ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন ।—

"১৬৮। পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্ ।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥"

ইত্যাদি

নাটকটীর অভিনয় অবশ্য যে তেমন জমে নি একথাও হরিদাস ঘটনাপঞ্জীতে লিখে গেছেন ।

'বিয়োগবৈভবম' নামে খণ্ডকাব্যটি অবশ্য ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল । লক্ষ্য করার বিষয় এই যে হরিদাস এত অল্প বয়সে শুধু অতি-গম্ভীর স্রগ্ধরাই নয় অতি-চটুল মালিনীকেও স্ববশে এনেছেন ।

হরিদাসের বই লেখা ও লেখাপড়া দুই-ই সমানতালে এগিয়ে চলেছে । ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কোটালিপাড়া কেন্দ্রে কাব্যের আদ্যপরীক্ষায় বসেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হন । সেই বছরই সরকার আঞ্চলিক পরীক্ষা-সভাগুলি নিয়ন্ত্রন করার দায়িত্ব নেন । সাবেকী নিয়ম-কানুন তখনও একেবারে বাতিল হয় নি, নতুন রীতি পদ্ধতিও পুরোপুরি চালু করা ঘটে ওঠে নি । ঘটনাপঞ্জীতে সে কথা লেখা আছে—"ঐ বৎসর ঐ সভা গভর্ণমেণ্ট গৃহীত হইল, ঐ সভাতে ৩ দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্টের নিয়ম ২ দিন, অতএব ⅓ একতৃতীয়াংশ নম্বর সকলেরই কাটিয়াছিল । তাহাতে বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াও বৃত্তি পাই নাই ।—উহার প্রশংসাপত্র ১০ শ্রাবণ পাইয়াছি ।" প্রশংসাপত্রের জন্য তিনি অবশ্য মোটেই অপেক্ষা করে থাকেন নি । বৈশাখ মাসে আদ্য পরীক্ষা দেবার পর, শ্রাবণ থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তিনি 'অমরকোষ' অভ্যাস করলেন । এর পর তিনি ঐ

বয়সেই (১৩০২ সনের মাঘ মাসে) বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিদ্যারত্নের সহিত·ব্যাকরণের বিচারে বসেন। সে বিচারসভার খুঁটিনাটি আমাদের জানা নেই। তবে এই বিচারের ফলে পণ্ডিতসমাজ তাঁকে দিয়েছিলেন সম্মান ও স্বীকৃতি। আর অভিজ্ঞতার প্রথম ও বড়গোছের একটা অঙ্কও জমা পড়েছিল তাঁর জীবনের খতিয়ানে। এর আগেই—(১৩০২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ থেকে) তিনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন মশায়ের কাছে ন্যায় (ভাষাপরিচ্ছেদ) পড়তে আরম্ভ করেছেন। সিদ্ধান্ত পঞ্চানন মশায় তখনকার দিনে ফরিদপুর জেলার একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রায় অজাতশত্রু। ১৩০৪ সনে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত। জীবিতকালে তাঁর ডাক নাম ছিল 'পুঁথি'—অর্থাৎ বেশীর ভাগ পুঁথিই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। আর আমাদের ভাবতে ভাল লাগে যে এই চিরকেলে অভাবী পণ্ডিত মানুষটি যখন তখনকার শিক্ষা অধিকর্তা ক্রাফট্ সাহেবের মুখে শুনলেন যে নবদ্বীপের পাকা টোলে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলে বেতন নিতে হবে, তখনি তিনি সে বাসনা বিসর্জ্জন দিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। তাঁর সম্পর্কে এর বেশী আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। এদিকে বছর ঘুরে গেল। ১৩০৩ সনে শ্রাবণের শেষে হরিদাস 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' পড়া সুরু করলেন। ১৩০৪ সনের ১১ই ভাদ্র পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি পরলোক গমন করেন। হরিদাসের জীবনের প্রথম অধ্যায়ও এখানেই শেষ হল বলা যেতে পারে।

শ্রীহেমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়-জীবনী'তে লিখেছেন যে—"২২ বৎসর বয়সে হরিদাসের পিতামহের মৃত্যু হইলে সংসারে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। এই সময়ে পিতার আদেশে ইনি কলিকাতার ২নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাব্য পড়িতে গমন করেন। পিতামহ কাশীচন্দ্র কাব্য ও ইংরেজী পাঠের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন বলিয়া ইনি জীবিত থাকিতে হরিদাসের কাব্য পড়া সম্ভব হয় নাই।" পিতামহ কাশীচন্দ্র জীবিত থাকতেই কিন্তু হরিদাস পাঁচসর্গাত্মক খণ্ডকাব্য 'শঙ্করসম্ভব' রচনা করেছিলেন। 'কংসবধ' ও 'জানকীবিক্রম' নাটক দুটী রচিত ও অভিনীত হয়েছে কাশীচন্দ্রের মৃত্যুর আগে। কাব্যরস এ তিনখানি বই-এর মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল। তাছাড়া হরিদাস ১৩০২ সনের বৈশাখ মাসে 'শ্রীযুক্ত পিতামহদেবের নিকট হইতে কোটালিপাড়া কেন্দ্রে' কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই কাশীচন্দ্র কাব্য-

পাঠের ঠিক কতটা বিরোধী ছিলেন তা বলা শক্ত।

হরিদাস শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে উত্তররাম চরিত পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু কি জানি কেন বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে বিশেষ 'সুবিধা' পান নি। তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে—"১৩০৪ সনের ২রা কার্ত্তিক কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাব্য মধ্য পরীক্ষা দিবার জন্য উত্তররামচরিত পড়িতে আরম্ভ করিয়া তত সুবিধা না পাওয়ায় নিজে নিজে দেখিতাম। এবং ঐ সময় অত্যল্প মূল্যে নৈষধপ্রভৃতি বহুতর পুস্তক পুরাতন পুস্তকালয় হইতে সংগৃহীত হয়। ১৩০৪ সনের (ইং ১৮৯৮ সনের) ফাল্গুন মাসে নিজে ২ ভারবি, শকুন্তলা, উত্তর রামচরিতের শেষাংশ এবং কাদম্বরী পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ দেখিয়া পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম বলিয়া শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে কোটালিপাড়া কেন্দ্রে কাব্যের মধ্যে পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪৲ টাকা হারে ২ বৎসর ভোগ্যবৃত্তি পাই।—" যুবক হরিদাসের সেই প্রথম কলকাতা দর্শন। দূর-দুর্গম গ্রামাঞ্চল থেকে তিনি প্রথম কলকাতায় এলেন—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সসাগরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা। কিন্তু সে কলকাতার চোখ-ঝলসানো জৌলুস তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। তিনি শুধু জেনে গেলেন যে কলকাতার পুরানো বই-এর দোকানে নামমাত্র মূল্যে সংস্কৃত বই পাওয়া যায় এবং বেশ কিছু বই কিনেও নিলেন। দেশে ফিরে তিনি পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েন তাঁর পিতার কাছে। তাঁর 'বৈদিক বাদমীমাংসা' বইটিও ১৩০৪ সনের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে লেখা। বৈদিক ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ও তাঁদের কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে আসার ইতিহাস ছিল বইটির বিষয়বস্তু। বইটি ছাপা হলে বা তার পাণ্ডুলিপি অন্তত পাওয়া গেলে একটা তথ্যপূর্ণ কুলজী গ্রন্থ আমাদের পাঠাগারে থেকে যেত।

১৩০৪ সনের ফাল্গুন মাসে চাঁদসী নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই ভাবে সুরু হ'ল তাঁর ভবিষ্যৎ বাগ্মিতার প্রস্তুতিপর্ব্ব। ঐ সনেই তিনি গৈলার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্করত্নের সহিত ন্যায়ের বিচারে বসেন। ফলে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরকালের বিচার-সিংহ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ যে বিচারের ফলাফলকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর বেশ কয়েক বছর পরে লেখা 'রুক্মিণীহরণ' মহাকাব্য পড়লে জানা যায়।—

"মহীক্ষিতো বীক্ষ্য বিদাং বিচারণং
সুবিস্মিতাঃ সস্মিতমূচুরীদৃশম্।

জয়ত্যদো মানপণং বিচারণং
রণো হি নঃ প্রাণপণঃ সুদারুণঃ ।।" (৩৪)

(তৃতীয় সর্গঃ)

(সভাস্থিত রাজারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিচার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মৃদু হাস্য সহকারে এইরূপ বলিতেছিলেন—'এই বিচারই শ্রেষ্ঠ ; কেননা ইহার পণ মান, আর আমাদের যুদ্ধ অতিদারুণ ; কারণ, তাহাতে পণ প্রাণ ।')

ইতিমধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেবার ও উপাধি দেবার সরকারী ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। সরকারী উপাধির জৌলুসও ধীরে ধীরে পণ্ডিতসমাজকে আকর্ষণ করতে সুরু করেছে। কিন্তু ঢাকার সারস্বত সমাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের মর্য্যাদা তখনও কিছুমাত্র কমে নি। তাই ১৩০৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিদাস ঢাকার সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। যে 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে চিরদিনের মত গেঁথে গেছে সেটিও তিনি এই সূত্রে সারস্বত সমাজের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন নগদে সাত টাকা ও একখানি শীতের কাপড়। এ সব কথা তাঁর 'ঘটনাপঞ্জীতে'ই লেখা আছে। 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত' পড়লে মনে হয় যে তিনি ১৩০৯ সনে ঢাকার 'সারস্বত সমাজে'র এই পরীক্ষাটীতে বসেছিলেন। অর্থাৎ প্রায় চার বছরের হেরফের। আমাদের সৌভাগ্য যে হরিদাসের উপাধিদানপত্রগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। ঢাকার সারস্বতসমাজের উপাধিদানপত্রে পরিষ্কার লেখা আছে যে হরিদাস শব্দাচার্য্য, জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নামে, ১৩০৪ সালের (ঊনবিংশত্যাধিকাষ্টাদশশত শকাব্দীয়) কাব্যশাস্ত্রের পরীক্ষায় বসেছিলেন। এবং তিনি এই 'পরীক্ষায়ামত্যন্তমুৎকর্ষমদর্শয়ৎ'। উপাধি পত্রটী অবশ্য তিনি ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ অনুযায়ী ১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসেই পেয়েছিলেন। 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি পাবার আগেই তিনি কোটালিপাড়া কেন্দ্র থেকে, ১৩০৫ সনে (ইং ১৮৯৯ সনে), জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নামে, সরকারী সংস্থায় কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় বসেন। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কাব্যতীর্থ উপাধি পান। হরিদাস তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে ঠিকই লিখেছেন যে উপাধিপত্রে 'নীলমণি মুখোপাধ্যায় ও ডিরেক্টর পেড্‌লর সাহেবের স্বাক্ষর আছে।' আবার এই সালেই তিনি প্রথম ভাগবত পাঠ করে যশ ও সুনাম পেয়েছিলেন। এতসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পিতার কাছে পুরাণ ও জ্যোতিষ পড়তেন। এই গুরুতর পরিশ্রমের প্রথম চোট পড়ে তাঁর চোখের ওপর

—মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। যথানিয়মে ১৩০৫ সন চলে গেল, নতুন বছর এল। ১৩০৬ সনের ৭ই আষাঢ় হরিদাস কবিরাজপুরের টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়তে সুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তরকালে সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তে লিখেছেন— "ইহার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কবিরাজপুরের প্রসিদ্ধ ধনবান ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় নিজ বাটীতে একটি টোল স্থাপন করেন। তাহার অধ্যাপক ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ননীক্ষীর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ প্রয়োজনে কোটালিপাড়ায় আসিয়াছিলেন। তখন তিনি শুনিলেন যে,, আমি স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করি। ইহা জানিয়া তিনি আমার পিতৃদেবের নিকট আসিয়া এবং তাহার নিকট বলিয়া আমাকে ছাত্ররূপে কবিরাজপুরের নিজ টোলে লইয়া যান। আমিও তাঁহার নিকট ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করি।" উপযুক্ত অধ্যাপকের আন্তরিকতার সঙ্গে মেধাবী ছাত্রের উৎসাহের মণিকাঞ্চন সংযোগ হ'ল। এখানেও কিন্তু আবার আমরা সন-তারিখের গোলমাল দেখতে পাই। কোন সনে তিনি কবিরাজপুরে স্মৃতি পড়তে আরম্ভ করেন—১৩০৬ (ঘটনাপঞ্জী) না ১৩০৫ (সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত)? আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি ১৩০৫ সনে প্রথম ভাগবত পাঠ করে সুনাম পেয়েছিলেন। আবার ১৩০৫ সনের ফাল্গুন মাসেই তিনি কোটালিপাড়া কেন্দ্র থেকে সরকারী সংস্থায় কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্যভাবেই এসে যায় যে হরিদাসের পক্ষে ১৩০৫ সনে কবিরাজপুরে গিয়ে স্মৃতি পড়া আরম্ভ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঘটনাপঞ্জীতে লেখা সন-তারিখ, অর্থাৎ ৭ই আষাঢ়, ১৩০৬ সনই আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। এই ১৩০৬ সনেই হরিদাস লাভ করেছেন প্রথম পুত্র-সন্তান শশিশেখরকে, কিন্তু হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সরলাসুন্দরীকে। তিনি তাঁর খতিয়ানে লিখেছেন—"১৩০৬ সনের ভাদ্রমাসে শ্রীমান্ শশিশেখরের জন্ম। ১৩০৬ সনের ৫ই মাঘ পৌষী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আমি কবিরাজপুরে থাকিতে দারুণ কলেরা রোগে ৫ ঘণ্টার মধ্যে সরলাসুন্দরীর মৃত্যু হয়।" অত্যন্ত শোকাবহ এক ঘটনার অতি আবেগহীন বিবরণ! অধ্যয়নতপস্যারত ছাত্রের শোক করার সময় কোথায়! মাঘ মাসে পত্নীবিয়োগের পর ফাল্গুনেই তিনি উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং বিষয়বস্তু ব্যাকরণ। ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে—"১৩০৬ সনের (ইং ১৯০০ সনের) ফাল্গুন মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শ্রীযুক্ত পিতৃদেবের নামে

ব্যাকরণোপাধি পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম উত্তীর্ণ হই, সে বৎসর ব্যাকরণে প্রথম বিভাগ ছিল না। উহাতে ২৫৲ টাকা পুরস্কার পাই।" উপাধিপত্রেও তাঁর দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হবার কথাই বলা আছে। সুতরাং 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত'-এ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার কথাটী তাড়াহুড়োর মধ্যেই লেখা ও ছাপা হয়েছে বলেই মনে হয়।

এই সব সুখদুঃখের স্মৃতি নিয়ে কিছুদিন আগে উনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিয়েছে, নতুন ধ্যানধারণার ও সম্ভাবনার সম্ভার নিয়ে বিংশ শতাব্দী এসেছে। কিন্তু তরুণ জ্ঞানভিক্ষু হরিদাসের জীবন এগিয়ে চলল তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের পথ ধরে বিরামহীন ছন্দে। সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে তিনি ফিরে এলেন। কলকাতার নাগর সভ্যতা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটী কথা কোথাও লিখলেন না—কারণও নেই, সময়ও নেই। ১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি পিতৃদেবের নামে ঢাকা সারস্বত সমাজে পুরাণের উপাধি পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষকমণ্ডলী তাঁকে 'পুরাণশাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে একটি রোপ্য পদক, একজোড়া গরদের ধুতি ও নগদ ১৪৲ টাকা। এ সব কথা আমরা জানতে পারি তাঁর 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত' থেকে। কিন্তু ঘটনাপঞ্জীতে তিনি লিখেছেন—"...১৩০৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকা সারস্বত সমাজে পিতৃদেবের নামে পুরাণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে সর্ব্বপ্রথম হইয়া ৫৲ টাকা নগদ, শীতকাপড় ১ থান, ৩৲ টাকা ও রৌপ্যপদক একটি পাইয়াছিলাম। উহার প্রশংসাপত্র ১৮২৩ শাকের ৬ জ্যৈষ্ঠের, উপাধি পুরাণশাস্ত্রী।..." পুরস্কারের অঙ্ক ও উপকরণের কথা বাদ দিলেও, এক বছরের মত সময়ের হেরফের থেকে যায়। তাই এ ক্ষেত্রেও আমাদের উপাধিদানপত্রের ওপরই নির্ভর করতে হবে। উপাধিদানপত্রের শাক ও তারিখটি ঠিকভাবেই ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে—অর্থাৎ ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮২৩ শকাব্দ। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছিলেন হরিদাস ১৩০৬ সনে (১৮২১ শকাব্দে), ১৩০৭ সনে নয়। ১৩০৭ সনের প্রথমেই (জ্যৈষ্ঠ মাসে) হরিদাস 'ঢাকার বাল্যাশ্রমে নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামীবক্তার নিকট—প্রবীণ সভায়' সংস্কৃতে বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তাঁর যথেষ্ট নাম ও যশ হয়েছিল। ১৩০৭ সনের ৪ঠা শ্রাবণ হরিদাসের জীবনের একটী স্মরণীয় তারিখ। ঐ দিন তাঁর "সাধুহাটী উজিরপুরের ভরদ্বাজগোত্র শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র কৃতিরত্নের জ্যেষ্ঠা কন্যার (১২।১৩ বর্ষীয়া) সহিত দ্বিতীয় পরিণয় হয়। (কুসুমকামিনী)।" (ঘটনাপঞ্জী)। কিন্তু তিনি পড়া, পরীক্ষা ও বিচার নিয়েই ব্যস্ত। ফাল্গুন

মাসে তিনি কোটালিপাড়া কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামে স্মৃতির আদ্য পরীক্ষা দিলেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে গুণানুসারের দু'বছরের জন্য ভোগ্য বৃত্তি পেলেন। তার আগে মাঘ মাসে কবিরাজপুরের পার্ব্বতীচরণ রায়ের শ্রাদ্ধে রংপুরের যাদবেশ্বর তর্করত্নের সহিত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে তাঁর সুনাম ও যশ অম্লান থাকে। ১৩০৮ সন এসে গেল। সাংখ্য দর্শনের পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তে' অবশ্য হরিদাস নিজেই বলেছেন যে তিনি ১৩০৭ সনের বৈশাখ মাসে ঢাকা সারস্বতসমাজে সাংখ্যদর্শনের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'সাংখ্যরত্ন' উপাধি, একখানি আলোয়ান এবং ২০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঘটনাপঞ্জীতে প্রায় একই কথা লেখা আছে; তবে বৈশাখ মাসের বদলে আছে জ্যৈষ্ঠ মাস আর ২০৲ টাকা পুরস্কারের জায়গায় ৫৸০ মাত্র। কিন্তু ঢাকা সারস্বত সমাজের 'উপাধিদানপত্রম্' এ পরিষ্কার লেখা আছে যে হরিদাস পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৮২৩ শাকে; অর্থাৎ ১৩০৮ সনে, ১৩০৭ সনে নয়। 'উপাধিদান-পত্রম্'টীর তারিখ অবশ্য নির্ভুলভাবেই ঘটনাপঞ্জীতে বলা আছে—২রা আশ্বিন, ১৮২৫ শকাব্দ। সাংখ্যদর্শনের পরীক্ষা তিনি তাঁর অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মশায় ও পিতৃদেবের নামে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থাগতিকে দর্শনশাস্ত্র তিনি একরকম নিজে নিজেই অভ্যাস করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে হরিদাসের এই পরীক্ষায় সাফল্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। ১৩০৮ সনে সব চেয়ে বড় খবর অবশ্য হরিদাসের 'বিরাজসরোজিনী' নাটিকা রচনা। নাটিকাটির রচনাকাল নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ তিনি রেখে যান নি। শেষ শ্লোকের শেষাংশে তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে গেছেন—

"শাকে ধরাক্ষি-বসু-চন্দ্রমিতে সুকর্ম্মা
শ্রীমানিমাং রচিতবান্ হরিদাসশর্ম্মা ॥"

সাহিত্যদর্পণকারের অনুশাসন মেনে নবীন নাট্যকার তিনটী ভাষা ব্যবহার করেছেন—সংস্কৃত, শৌরসেনী ও পৈশাচী। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাটিকাটির কিছুটা পড়ে বলেছিলেন—"পুস্তকখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ নাটক রচনা করিবার লোক আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। কিমধিকমিতি।"—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা, নারিকেলডাঙ্গা, ২০শে আষাঢ়, ১৩১৮। নাটিকাটি লেখা হয়েছে ১৩০৮ সালে, কিন্তু স্যার গুরুদাসের আলোচনার তারিখ হ'ল ২০শে আষাঢ়, ১৩১৮। তার কারণ এই যে বইটী ছাপা হয়ে বের হয় ১৩১৭ সালে

হরিদাসের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের গৌরব-টীকা অবশ্য তারই কপালে। নাটিকাটী বেশ কয়েক বারই বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। ১৩১২ সনের বৈশাখী সংক্রান্তিতে কবিরাজপুরের অভিনয়ের কথা হরিদাস তাঁর 'সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে' লিখে রেখে গেছেন—"…সন্ধ্যা ৭ টার পর বিরাট সভা হইল এবং অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রধার নান্দী পাঠ করিবার পর নটী যখন নৃত্য ও গান করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া তাহা সমাপ্ত করিল, তখন সভ্যগণের 'পুনঃ পুনঃ' এইরূপ আনন্দধ্বনি শুনিয়া নটী দুইবার নৃত্যসহকারে সেই গানটী গাহিল। রাত্রি দশটায় অভিনয় সমাপ্ত হইল। নাটিকা রচনার সৌষ্ঠব ও অভিনয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সভ্যগণ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রশংসা করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।" এই অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম ধাম আমরা জানতে পারি 'প্রথম সংস্করণ—বিজ্ঞাপনম্'-এর মাধ্যমে—"…অত্র চ সহোদরপ্রতিমাঃ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী-ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতয়ঃ সতীর্থাঃ, প্রিয়তমাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ-ব্যাকরণ-কাব্যতীর্থপ্রভৃতয়স্থাছাত্রাঃ, কুমারসুন্দরাকৃতিঃ সুকুমারমতিঃ পার্ব্বতীচরণস্যদ্বিতীয়াত্মজঃ শ্রীমান্ আশুতোষ রায়শ্চ অভিনয়েঽস্মিন্ স্ব-স্ব ভূমিকাসু নিতান্তনৈপুণ্যমদর্শয়ন্।…" কলকাতার রঙ্গমঞ্চের তখন (বিংশতাব্দীর গোড়ার দিকে) দারুণ দপ্‌দপার দিন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারেরা একের পর জনপ্রিয় নাটকগুলি রচনা করে চলেছেন। মিনার্ভা, ক্লাসিক, অরোরা, ইউনিক, ষ্টার, গ্র্যাণ্ড, থিয়েটার, ন্যাশনাল, কোহিনূর ইত্যাদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আসর তখন জমজমাট। সার্থক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী, দানীবাবু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ইত্যাদি। আর মঞ্চকুশলীদের মধ্যে ধর্ম্মদাস সুরের তখন দুর্দ্দান্ত নামডাক। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখনও প্রাচীন রীতি অনুসারে সংস্কৃত, শৌরসেনী ও পৈশাচীতে নাটক রচনা ও অভিনয় করে চলেছেন। কলকাতার নাটকের কিছু কিছু নমুনা হয়ত তাঁদের একেবারে অজানা ছিল না। হরিদাস নিজেই এর মধ্যে দু'দুবার কলকাতায় এসেছেন। 'বিরাজসরোজিনী'র অভিনয়ের সময় তিনি 'প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিবার উদ্দেশ্যে' কলকাতায় লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতভাষার প্রতি হরিদাসের অনুরাগ ও আনুগত্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। এর কারণ নির্ণয়ের দায়িত্ব উপযুক্ত পণ্ডিতব্যক্তির। প্রসঙ্গত আমাদের জানা দরকার যে 'বিরাজসরোজিনী' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা এখান থেকে হরিদাসের জীবনকথায় ফিরে যেতে পারি। ১৩০৮ সনে হরিদাস আর বেশী কিছু করতে

পারেন নি; কারণ তিনি প্রায় আট মাস "জ্বরে পীড়িত" ছিলেন। এ কথাটা তিনি অবশ্য বলেছেন সংসারে কম টাকা দেবার কৈফিয়ৎ হিসেবে। হরিদাসের সংসারের কথায় আমরা একটু পরেই ফিরে আসব। ১৩০৯ সনের সুরুতে শ্রাবণ মাসে তিনি ননীক্ষীর গোপালদাসের বাড়ীতে তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে কাওলীবেড়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তর্কভূষণের সহিত বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে স্মৃতির বিচার করেন। তারপর ফাল্গুনমাসে তিনি কোটালিপাড়া কেন্দ্রে সরকারী সংস্থায় স্মৃতির মধ্য পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ৪৲ টাকা হারে দু'বছরের জন্য বৃত্তি পান। দু'বছর বাদে তিনি স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে। তার আগেই তিনি বাগ্মিতা, বিচার-দক্ষতা ও সমস্যাপূরণ পারদর্শিতার জন্য যশস্বী হয়ে গেছেন। ঘটনাপঞ্জীতে তিনি এক কথায় বলেছেন—"১৩১০ সনের মাঘ মাসে রোয়াইল চন্দ্রপ্রতাপ রাজবাটী সংস্কৃতে বক্তৃতায় ও সমস্যাপূরণে যথেষ্ট নাম ও প্রতিপত্তি হয়।" ১৩১১ সনে সেনদিয়ার অম্বিকা মজুমদারের মাতৃশ্রাদ্ধের সভায় নিজের কৃতিত্বের কথাও হরিদাস সংক্ষেপেই লিখে গেছেন। 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়-জীবনী'তে একটু বিস্তারিতভাবে ঘটনাগুলি বলেছেন হেমচন্দ্র—"হরিদাসের যখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হয় নাই, সে সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামনিবাসী অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের 'তন্ত্রশাস্ত্র খণ্ডন' বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া ইনি বিশেষ যশস্বী হন। ইহার পর ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ পরগণাস্থ রমণীমোহন রায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধের বিশাল সভায় দিনাজপুর মহারাজের দ্বারপণ্ডিত প্রসিদ্ধ কবি মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি এবং বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সমস্যাপূরণ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া জয়লাভ করেন। এই সমস্যাপূরণ বিষয়ে প্রশ্নকর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী এবং মধ্যস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার প্রভৃতি। ইহাতে ইঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তারলাভ করে।…" পণ্ডিত সভায় সমস্যাপূরণের রেওয়াজ আজ আর নেই। তাই ব্যাপারটা যে কি তা অনেকের জানা নাও থাকতে পারে। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' থেকে বাংলাভাষায় সমস্যাপূরণের সুন্দর কাহিনীটী তুলে দিলাম।—

'আপনি সমস্যা-পূরণ করতে পারেন রায়মশাই?'

'সমস্যা-পূরণ?'

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন : 'আকবর বাদশাহ্ যেমন করতেন। আধ পঙ্ক্তি কবিতা বললেন, আর কোনো সভাসদ তা থেকে অর্থবোধক একটি সম্পূর্ণ কবিতা রচনা করে দিলেন।'

'বুঝেছি।'

'কবি যখন, আপনিও নিশ্চয় তা পারেন ?'

* * *

ভারতচন্দ্র মৃদুস্বরে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'খুব ভালো কথা।'—কৃষ্ণচন্দ্র একটু ভাবলেন, গোঁফে তা দিলেন একবার, একটুখানি কৌতুকের হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণায়, বললেন, 'এইটে পূরণ করুন'—"পায় পায় পায় না।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে ভেবে নিলেন ভারতচন্দ্র। তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন,--

'চিনিতে নারিনু আমি   আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদভূমি   আর কিছু চায় না,
খর্ব দেখি উপহাস   শেষে একি সর্বনাশ
স্বর্গমর্ত্ত্য দিব আশ   তাহে মন ধায় না॥
গেল সকল সম্পদ   এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে একপদ   ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুনে হৃদিপ্রিয়ে   বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে   পায় পায় পায় না।'

সংস্কৃতে ব্যাপারটা আরও শক্ত এবং কবির স্বাধীনতা সেখানে রীতিমত সীমিত। প্রশ্নকর্ত্তা বলবেন একটী মাত্র চরণ। কবিকে আর শুধু তিনটী চরণ যোগ করে একটী মাত্র শ্লোকে প্রশ্নকর্ত্তার 'চরণ'টীর অর্থ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

এদিকে যথাসময়ে (১৩১১ সনের ফাল্গুন মাসে, ইং ১৯০৫ সালে), হরিদাস সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। হরিদাসের বিশ্বাস যে তিনি প্রথম বিভাগেই স্থান পেয়েছিলেন। তাই তিনি ঘটনাপঞ্জীতে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ রেখে গেছেন। একই সঙ্গে তিনি অবশ্য বসেছেন যে তিনি পঁচিশ টাকার সরকারী পুরস্কার এবং মাসিক সাত টাকা হারে এক বছরের জন্য ক্ষেত্রমণি দেবীর বৃত্তি পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে স্বনামধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং

আলেকজাণ্ডার পেড্‌লর সাহেব জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা। স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় হরিদাস প্রথম না দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছিলেন, এটা আজ আর খুব বড় কথা নয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে হরপ্রসাদ-হরিদাসের দেখা-সাক্ষাতের কোনো খবর আমাদের জানা নেই। সংস্কৃত কলেজে পড়লে নিশ্চয়ই হরিদাসের সে সুযোগ হত এবং আমরাও একটি সুন্দর বিবরণ পেতাম। হরিদাসের জীবনে ১৩১১-১২ সনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল কবিরাজপুরের পার্ব্বতীচরণ রায়ের বাটীতে মহাভারত পাঠ। যোগাযোগ হয় কলকাতাতেই—পার্ব্বতী রায় মশায়ের কলকাতার বাড়ীতে। স্মৃতির শেষ পরীক্ষাটী দিয়ে হরিদাস রায় মশাই-এর বাড়ীতে এসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রায় মশাই-এর স্ত্রী ধর্ম্মপরায়ণা বগলাসুন্দরী দেবী এসে তাঁর দেশের বাড়ীতে মহাভারত পাঠের কথা পাড়লেন এবং তাঁর বড় ছেলে কৃষ্ণদাস রায় ও ম্যানেজার যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সে কথা পাকা করলেন। হরিদাস মহাভারত পাঠের আয়োজন আরম্ভ করে দিলেন। তিনি কাকা জানকীনাথ শিরোমণিকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। সেখানে একদিন থেকে পিতামহদেবের হাতে-লেখা মহাভারতের পুঁথিগুলি নিয়ে নৌকা করে কবিরাজপুরে গিয়ে হাজির হলেন। শ্রীমতী বগলাসুন্দরী দেবী, কৃষ্ণদাস ও যদুনাথবাবু আগের দিনই সেখানে পৌছে গিয়েছেন। সকলে বসে ঠিক করলেন যে হরিদাস হবেন পাঠক; ধারক হবেন তাঁর অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মশায় এবং বিদ্যারত্ন মশায়ের সতীর্থ শ্রীধর স্মৃতিতীর্থ; কথকের আসনে বসবেন জানকীনাথ শিরোমণি এবং আর আর সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা থাকবেন শ্রোতা হিসেবে। পরদিন (১৩১১ সনের ১৩ই ফাল্গুন) থেকেই মহাভারত পাঠ সুরু হ'ল এবং যথানিয়মে চলতে লাগল। এর মাঝে চৈত্রমাসের শেষে খবরের কাগজে স্মৃতির পরীক্ষায় হরিদাসের সাফল্যের কথা পড়ে সবাই খুব খুসী। কৃষ্ণদাস রায় হরিদাসের 'বিরাজসরোজিনী' নাটিকাটী অভিনয়ের প্রস্তাব করলেন এবং সকলেই এক কথায় তাতে সায় দিলেন। ঠিক হ'ল যে আগামী বৈশাখ মাসের (১৩১২ সন) বৃষসংক্রান্তির দিনে মহাভারত পাঠের উদ্‌যাপন হবে এবং সেই রাতেই হবে অভিনয়। আয়োজন সুরু হয়ে গেল। হরিদাস নিজেই সংস্কৃত শ্লোকে নিমন্ত্রণ পত্র লিখে দিলেন। সে নিমন্ত্রণপত্র ও অভিনয়ের প্রোগ্রাম কলকাতা থেকে ছেপে এল। তারপর নিমন্ত্রণলিপি চলে গেল দেশে ও বিদেশের পণ্ডিত, সামাজিক, কুলীন ও ঘটকদের কাছে। উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হ'ল।

বৈশাখী বৃষসংক্রান্তির দিন সকালে বিরাট চণ্ডীমণ্ডপের সামনে আটচালার

গা-ঘেঁষে ব্যাসাসনের উত্তর দিকে 'সভাস্থান' তৈরী করা হয়ে গেল। সময়মত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুলীন, ঘটক ও সামাজিকগণেরা এসে আসনে বসলেন। তারপরের কথা হরিদাসের জবানীতেই ('সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত') পড়তে ভাল লাগবে। —"এই সময়ে আমি ব্যাসাসনের পূর্ব্বপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজ রচিত ৮টি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া অতি বিনীতভাবে সংস্কৃত ভাষায় সামান্য বক্তৃতা করিয়া উচ্চ ব্যাসাসনে বসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; পণ্ডিতগণ অনুমতি করিলে আমি সেই আসনের মধ্যস্থানে যাইয়া বসিলাম; প্রাচীন ধারক দুইজনও উঠিয়া আমার দুইপার্শ্বে বসিলেন; আমি অর্দ্ধঘণ্টায় মহাভারতের অল্প অবশিষ্ট অংশ পাঠ সমাপ্ত করিলাম। পরে আমরা যাইয়া সভায় বসিলে কথক মহাশয়ও অনুমতি লইয়া ব্যাসাসনে বসিয়া কথকতা সমাপ্ত করিলেন; সভা হইতে পাঠ ও কথকতা উভয় বিষয়েই ভূয়সী প্রশংসা হইল। পরে বিদ্যারত্ন মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বগলাসুন্দরী দেবীকে দিয়া দক্ষিণা করাইলেন; ক্রমে তিনি সভার প্রান্তে আসিয়া রাত্রি ৭ ঘটিকার সময়ে সংস্কৃত নাটক 'বিরাজসরোজিনী'র অভিনয় আরম্ভ হইবে —ইহা জানাইয়া সকলকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।…"

অভিনয়ের কথা আমরা আগেই বলেছি, সুতরাং উদ্ধৃতিটী এখানেই শেষ করা হ'ল। এখন আমরা মহাভারতের পাঠ ও পাঠক সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে পারি। তখন সমাজে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল—

"শৃনোতি শ্রাবয়েদ্বাপি সততঞ্চৈব যো নরঃ
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবং সদমাপ্নুয়াৎ ॥১৭৪॥

"যে মানুষ সর্ব্বদা মহাভারত শ্রবণ করে, কিংবা শ্রবণ করায়, সেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণুপদ লাভ করে।"*

অবশ্য সে মহাভারত পাঠ তেমন তেমন ব্যাপার নয়। আমরা ছেলেবেলায় (তৃতীয় দশকে) শহরতলীতে কথকতা শুনেছি। কথকেরা সকলে সুদর্শন না হলেও সুরেলা গলার অধিকারী হতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কথা ও কাহিনী তাঁরা গল্প করে ছড়া কেটে বা গান গেয়ে বলে যেতেন। কথাবার্তাও তাঁরা বেশ রসিয়েই বলতেন। কিন্তু এ মহাভারত পাঠের ধরন-ধারণ-ই একেবারে আলাদা জাতের। এ যেন প্রণালীবদ্ধ পাঠযজ্ঞ। এ যজ্ঞের প্রধান হোতা হতেন পাঠক এবং তাঁর সঙ্গে থাকতেন ধারক ও কথক। 'সর্ব্বজনমাননীয়' ব্রাহ্মণই

মহাভারত পাঠের অধিকারী হতেন। পাঠকের গুণাবলীর বিবরণ মহাভারতেই আছে—

"শুচিঃ লীলান্বিতাচারঃ শুক্লবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংস্কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥৮৮॥
রূপবান্ সুভগো দান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দানমান গৃহীতশ্চ কার্য্যো ভবতি বাচকঃ ॥৮৯॥ (যুগ্মকম্)
(স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—৫ম অধ্যায়)

(পবিত্র, সৎস্বভাব, সদাচার, পরিষ্কৃত বস্ত্র, জিতেন্দ্রিয়, উপনয়নাদিসংস্কারযুক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াশূন্য, সুন্দর মূর্ত্তি, যশস্বী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সকলেরই দানের পাত্র ও মাননীয় ব্রাহ্মণকে পাঠক করা কর্ত্তব্য ॥৮৮—৮৯॥)*

এক আধারে এত গুণের সমন্বয় এ যুগে বোধহয় সম্ভব নয়। তবে তখনকার দিনে কোটালিপাড়া ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন প্রবীণ ব্রাহ্মণ দুর্লভ ছিল না। কিন্তু 'যোগ্যতাজ্ঞানবতী' বগলাসুন্দরী দেবী যুবক হরিদাসকেই পাঠকের পদে বরণ করেছিলেন। স্পষ্টতই মনে হয় যে তখনই হরিদাসের শাস্ত্র ও ধর্ম্মজ্ঞানের খ্যাতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপযুক্ত ছাত্রের এই নির্ব্বাচন প্রবীণ অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মশাই সানন্দে মেনে নিয়েছেন এবং তিনি ও তাঁর সতীর্থ ধারকের আসনে বসেছেন। পাঠশুরু হয় ১৩১১ সনের ১৩ই ফাল্গুন এবং শেষ হয় ১৩১২ সনের বৈশাখী বৃষসংক্রান্তির দিন। মাত্র দু'মাস আঠার দিনে সম্পূর্ণ মহাভারতের পাঠ শেষ করা বিশেষ কৃতিত্বের কথা। মহাভারত পাঠের নিয়মবন্ধনের সন্ধান ও আমরা মহাভারতেই পাই—

"অবিলম্বমনায়স্তমদ্রুতং ধীরমূর্জ্জিতম্।
অসংসক্তাক্ষরপদং স্বরভাবসমন্বিতম্ ॥৯০॥
ত্রিষষ্টিবর্ণসংযুক্তমষ্টস্থান সমীরিতম্।
বাচনযদ্বাচকঃ স্বস্থঃ স্বাসীনঃ সুসমাহিতঃ ॥৯১॥ (যুগ্মকম্)
(স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—৫ম অধ্যায়)

(সুস্থদেহ তাদৃশ পাঠক সুখোপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবেন। অবিলম্ব, অদ্রুত ও আয়াসশূন্যভাবে, গম্ভীরস্বরে, অনতিদীর্ঘকণ্ঠে, স্পষ্টভাবে,

---

* ঐ

রসসূচনা সহকারে এবং সমস্ত বর্ণের যথাযথ উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ করিতে থাকিবেন ॥৯০—৯১॥)*

সম্পূর্ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ করা সম্ভব নয়। তবে বার বার যিনি মহাভারত পড়েছেন কেবল তিনিই পারেন উপরের অনুশাসন মেনে (আয়াসশূন্যভাবে) ছ মাস আঠার দিনে পাঠ শেষ করতে। উত্তর কালে একা মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ রচনা করার দুশ্চর ব্রত হরিদাস মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কবিরাজপুরের মহাভারত পাঠ যেন সে ব্রতরই প্রস্তুতিপর্ব্ব। এমনকি পিতামহের লেখা যে পুঁথি ধরে তিনি পাঠ করেছিলেন, সেই পুঁথিটাকেও তিনি যথা সময়ে ‘আদর্শ পুস্তক’ বলে বেছে নিয়েছিলেন। উদ্‌যাপনের দিনে উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর অনুমতি নিয়ে ব্যাসাসনে বসার শোভন সুন্দর প্রথাটীর সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিনম্র ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। ‘সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন’ করানো এ যুগে আর সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভুরিভোজনের ও আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিলেন বগলাসুন্দরী।

মহাভারতের পাঠ শেষ হল। কবিরাজপুরের রায়মশাই’দের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সকলেই পালা করে হরিদাসকে চারদিন ধরে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করলেন। মহাভারতের পাঠক ‘গুরুস্থানীয়’ এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করলে সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়—এ কথাও মহাভারতেই লেখা আছে। আবার ৬ই জ্যৈষ্ঠে হরিদাস ‘নিতান্ত ভক্তিভাজন পরমপূজ্যপাদ’ অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ সমাপ্তি করলেন। অধ্যাপক তাঁকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে সারস্বত সমাজের ‘সিদ্ধান্তবাগীশ’ উপাধিটাই ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। তারপর ৭ই জ্যৈষ্ঠ, প্রচুর নামযশ এবং মহাভারত পাঠের দক্ষিণা ও জিনিষপত্র নিয়ে হরিদাস প্রসন্ন মনে বাড়ী ফিরে এলেন। দক্ষিণাবাবদ হরিদাস কি পেয়েছিলেন তা জানবার সুযোগও আমাদের আছে। হরিদাস নিজেই তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে সে সব কথা লিখে রেখে গেছেন—

“পূর্ব্ব সনের ১৭ ফাল্গুন ৫৲ ৭ চৈত্র ২০৲ মোট	…	২৫৲
১১ বৈশাখ লক্ষ্মী বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	…	২৫৲
২ জ্যৈষ্ঠ মধ্যম খুড়া বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	…	২৲
৫ জ্যৈষ্ঠ মহাভারতের দক্ষিণাদি	…	১১০৲
		১৮২৲

---

* ঐ

সোনা এক ভরি সাড়ে ছয় আনা (মূং অং)	৩৪॥০
শাল এক জোড়া (মূং অং)	২০৲
গরদ ১ থান—ঐ	৪৲
চেলির জোড়—১টা ”	৪৲
চেলির সাড়ি ১ খানা ”	৩৲
কাঁসার বাটী ৭ টা ”	৩॥০
পিতলের ঘটী ৩ টা ”	১॥০
কাঁসার থাল ১ খানা ”	২॥০
সুতার কাপড় মোট ”	১৫৲
সংসারে পিতৃ ঠাকুরের নিকট দত্ত মোট—	২৫০৲
১৩১২ সনের ৮ জ্যৈষ্ঠ নগরবাসী সাহার নিকট হইতে জিনিষ খালাস ময় সুদ	১৬৲
ঐ রোজ কালীনাথ চৌধুরীর খতের ওয়ুলদিয়া সুদ ও আসল বাং	৭৭॥০
	৯৩॥০

মাং = মারফত, বাং = বাবদ, মূং অং = মূল্য অনুমান

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা মনে পড়ে। ‘সংক্ষিত পূর্ব্ববৃত্তান্তে’ লেখা আছে যে হরিদাস স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১১০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঘটনাপঞ্জী এ কথার সমর্থন করে না। তারপর একশ দশ টাকা তখন অনেক টাকা। কিন্তু হরিদাস আয়-ব্যয়ের হিসেবের মধ্যে এ টাকাটা ধরেন নি। কাজেই পুরস্কারের অঙ্কটা নিয়ে মনে একটু খটকা থেকে যায়।

হিসেবের দিকে চোখ ফেরালেই প্রথমেই একটা যোগের ভুল দেখতে পাই। প্রথম দফার অঙ্কগুলি যোগ করলে হয় ১৬২৲, ১৮২৲ নয়। আবার ১৬২৲ না হলে সর্ব সমতে ২৫০৲ টাকার জায়গায় ২৭০৲ হয়। সে যাহোক ধর্মপ্রাণা বগলা-সুন্দরী দেবী ‘বিত্তশাঠ্য’ অর্থাৎ দানদক্ষিণায় কার্পণ্য করেন নি। তখন দিনও ছিল সস্তাগণ্ডার। এবং সে দিনের জিনিষপত্রের মায় সোনার দামের খবরও ঐ ফিরিস্তিটির মাধ্যমে পেয়েছি। সব থেকে বড় কথা যে হরিদাসের সংসারের

আর্থিক অবস্থার সঙ্গেও এই সূত্রে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। সংসারের অবস্থা শুধু অস্বচ্ছল নয়, প্রায় অচলই বলা যেতে পারে—জিনিষপত্তর বাঁধা দিয়ে, খত লিখে দিয়ে টাকা ধার করে সংসার চালাতে হচ্ছে। বই কিনে পড়ার মত অবস্থাও হরিদাসের তখন ছিল না। তাই স্মৃতির পরীক্ষার্থী নিজের হাতেই রঘুনন্দনের স্মৃতির পুঁথি লিখে নিয়েছেন ১৩০৮ সনে। তাঁর হাতের লেখা একটা পাতার প্রতিলিপি সঙ্গে দেওয়া হল। হাতের অক্ষর তাঁর সুন্দর ত বটেই; লেখার ছাঁদও চমৎকার। এ শুধু লেখা নয়, যেন শিল্পকর্ম; কে বলবে যে হরিদাস তখন অভাবের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন! ঘটনা-পঞ্জীতে তিনি দফায় দফায় আয়-ব্যায়ের হিসেব লেখার সময় ধার, সুদ ও আসল সবকিছুরই উল্লেখ করেছেন; কিন্তু বিরক্তি, হতাশা বা খেদের আভাসমাত্রও কোথাও নেই। পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গোটা সংসারের ভারই তখন তাঁর ওপর—কিন্তু তাই নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। দারিদ্র্যকে বোধহয় তিনি ব্রাহ্মণের বিধিলিপি বলেই মেনে নিয়েছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিরাজপুর থেকে ফিরে আষাঢ় মাসেই তিনি এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিলেন। আর্য্যশিক্ষা সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত 'আর্য্য বিদ্যালয়' তখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল। শেষ চেষ্টা হিসেবে সমিতির প্রধান সম্পাদক শ্রীরেবতীমোহন কাব্যরত্ন মশায় এক সভায় সমস্ত গ্রামবাসীকে জমায়েৎ করলেন। বিদ্যালয়ের অবস্থার কথা আলোচনা করার পর তিনি প্রস্তাব রাখলেন যে গ্রামের কৃতবিদ্য ছেলে হরিদাসকে একলাই অধ্যাপনা ও পরিচালনার ভার দিলে, বিদ্যালয়টী বিলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। গ্রামবাসী সকলেই সানন্দে সম্মত হলেন। তখন স্থির হ'ল যে গ্রামের মাঝামাঝি কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বারবাড়ীতে বিদ্যালয়টীকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ফরিদপুর ডিষ্ট্রিকট বোর্ডের মাসিক সাহায্যের দশটী টাকা পাবেন অধ্যাপক। হরিদাস সব কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। গোটা গ্রামের লোক মিলে অধ্যাপক নির্বাচন ও বরনের কথা পড়তে ভালই লাগে। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীরা হরিদাসের জন্য আরও পাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। ১৩১২ সালের ১২ই আষাঢ় ('সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত'মতে ১৩ই আষাঢ়), কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বিরাট আটচালায় গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে হরিদাস অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। এই সঙ্গে তাঁর অধ্যাপক জীবনেরও শুভারম্ভ হ'ল।

হরিদাস মহাভারত পাঠ সেরে কবিরাজপুর থেকে বাড়ী ফেরেন ৭ই জ্যৈষ্ঠ

এবং আর্য্যবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন ১২ই আষাঢ়। এরই মাঝে তিনি কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' এবং ভবভূতির 'মহাবীরচরিত'এর টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা শেষ করেন। এ কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন কবিরাজপুরের টোলে থাকবার সময়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার 'রুক্মিণী হরণ' মহাকাব্যও লিখতে শুরু করেছেন। 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'মহাবীরচরিতে'র টীকার বই দুটি ছেপে বার হয় নি। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র পাণ্ডুলিপিও খুঁজে বার করতে পারি নি। তবে 'মহাবীরচরিতে'র টীকার পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাওয়া গেছে। পাণ্ডুলিপিটির খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা—অনেক জায়গাতেই কালি উঠে গেছে ও পোকা লেগেছে। আতশী কাচের সাহায্য নিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও ভুলচুক্ সমেত শেষ পাতাটী (৪২৬ পৃঃ) থেকে কিছুটা তুলে দিলাম—

"জানকীবিক্রমং নাম নাটকং লক্ষণান্বিতম্।
হেমপ্রভাপরিণয়ং বিনির্ম্মায় নাটকং।
বিয়োগ বৈভবং নাম খণ্ডকাব্যং বিধায় চ
বৈদিকবাদমীমাংসা কুলগ্রন্থঞ্চ তৎপরং।
রুক্মিণীহরণং নাম মহাকাব্যঞ্চ কুর্বতা।
এষা বিরচিতা টীকা দোষোঽস্যাম্মৃগ্যতাং বুধৈঃ॥

ইতি বাচস্পতেয় শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কারাত্মজ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-বিরচিতায়াং মহাবীরচরিত টীকায়াং সর্বার্থবোধিন্যাং সপ্তমাঙ্ক বিবরণং সমাপ্তম্॥

সমাপ্তায়ং সর্বার্থবোধিনী।"

'রুক্মিণীহরণ,' হরিদাস ঠিক কবে থেকে লিখতে শুরু করেন, তা নিয়ে কথা উঠতে পারে, কিন্তু কোন তারিখে তিনি মহাকাব্যটীর রচনা শেষ করেছিলেন তা আমাদের জানার উপায় আছে। সে কথা সময়মত আলোচনা করা যাবে। এখন আমরা হরিদাসের টোলে ফিরে যেতে পারি।

হরিদাসের টোলে দেখতে দেখতে দূরদেশী ছাত্ররাও এসে জড় হ'ল। গ্রামের লোকেরা এগিয়ে এসে তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন; না হলে যে গ্রামের নাম ডুবে যাবে। হরিদাস নিজেও তাঁর বাড়ীতে পাচটী ছাত্রকে রাখলেন। তিনি তখনও ধার শোধ করে চলেছেন, বন্ধকা জিনিষপত্র খালাস করছেন,—আর্থিক অবস্থা রীতিমত কাহিল। কিন্তু তা বলে ত আর সনাতন প্রথা লঙ্ঘন করে শিক্ষার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। এদিকে পিতা

গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার প্রায় অশক্ত হয়ে পড়েছেন। অধ্যাপনা থেকে হাটবাজার পর্য্যন্ত সব কিছুই তাঁকে করতে হ'ত। তার সঙ্গে 'রুক্মিণীহরণে'র রচনাও আছে। কিন্তু তাহলেও কাব্যরত্নমশায় ও তাঁর গ্রামবাসীরা যে অধ্যাপক নির্ব্বাচনে বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি, বছর না ঘুরতেই হরিদাস তা প্রমাণ করলেন। চলতি বছরেই স্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় দুটী, সাংখ্যের আদ্য পরীক্ষায় দুটী এবং ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় তিনটী ও মধ্য পরীক্ষায় একটী ছাত্র উত্তীর্ণ হ'ল। তাদের নাম ধাম সবই লেখা আছে হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে। ফলে আর্য্য-বিদ্যালয়ের নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল; আর অধ্যাপক পেলেন এক বছরের জন্য মাসিক বার টাকা হারে সরকারী বৃত্তি। এমন সময় বিদ্যালয়টীর স্থান নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেল। বিদ্যালয়টীর সুনাম তখন কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে টোলবাড়ী ভরে ফেলেছে। তাদের সংখ্যা তখন দাঁড়িয়েছে একষট্টি। ফলে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এ সব দুঃখকষ্ট দেখে ভেঙে পড়লে ত আর শিক্ষার্থীর চলে না। তারা নিজেরাই রেঁধে বেড়ে খেয়ে টোলের লাগোয়া একটী ঘরে কোনোরকমে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ১৩১৩ সনের কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় দু'জন; ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় একজন, মধ্য পরীক্ষায় একজন ও আদ্য পরীক্ষায় দু'জন; এবং সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় একজন ও মীমাংসার আদ্য পরীক্ষায় দু'জন উত্তীর্ণ হ'ল। ঘটনাপঞ্জীর পাতা ওলটালে আমরা দেখতে পাই যে এই সব ছাত্ররা ছিল উনশিয়া, গৈলা, খলিসাকোটা, বেরমহল ও বচাইরপাড়ের ছেলে। বচাইরপাড়ের ছেলেটী মীমাংসার আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তিও পেয়েছিল। পরীক্ষার এই ফলাফল বাবদে ৮৲ টাকা হারে এক বছরের জন্য বৃত্তি পেলেন আর পেতে লাগলেন দেশে ও বিদেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ। আগেই অবশ্য তিনি নানাস্থানে পণ্ডিতসভায় বক্তৃতা দিয়ে ও বিচার করে প্রচুর যশ পেয়েছেন। ১৩১২ সনের চৈত্রে কালামৃধার বিচার সভায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিচারে ধরা দিয়ে পূর্ব্বপক্ষ পর্য্যন্তও করতে দেন নি। এই ধরনের বিচার সভা আজকাল আর বড় একটা বসে না। পণ্ডিতদের কাছে শুনেছি যে পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন করেন, আর তার জবাব দাখিল করেন উত্তর পক্ষ। কিন্তু উত্তর পক্ষ সুযোগ বুঝলে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, প্রশ্নটীকেই সরাসরি আক্রমণ করতে পারেন। একেই চলতি কথায় বলে 'ধরা দেওয়া'। আলোচ্য বিচার সভায় হরিদাস প্রশ্নটী এমনভাবে তছনছ করে দিয়েছিলেন, যে প্রতিপক্ষ

পূর্ব্বপক্ষই করতে পারেন নি—অর্থাৎ প্রশ্নটীকেই দাঁড় করাতে পারেন নি। ফলে বিচার আর এগোবে কি করে? বলা বাহুল্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকলে 'ধরা দিয়ে' কেউই বিচার সভায় জয়মালা পেতে পারেন না। তাঁর ছাত্র হরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণ-তীর্থও তখন বিচারে বেশ নাম করেছেন। ১৩১৩ সনের ফাল্গুন মাসে বীরভূমের হরিশ চাটুয্যের বাড়ীতে এক বিচার সভা বসে। বিষয় ছিল—বেদান্ত ও দায়ভাগ। হরিদাস দুইটী বিষয়েই উত্তর পক্ষ ছিলেন; অর্থাৎ উত্তর করেছিলেন। কোথায় বেদান্ত আর কোথায় দায়ভাগ! হরিদাসের বিদ্যার বিস্তার ও গভীরতা সেদিন পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল।

বিদ্যালয়ের স্থান নিয়ে গ্রাম্য ঘোঁট তখন রীতিমত পাকিয়ে উঠেছে। শেষ-পর্য্যন্ত গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের লোকেরা মিলে আগেকার সেই দুর্গাধন ন্যায়ভূষণের বারবাড়ীতেই আর একটী আর্য্য বিদ্যালয় খাড়া করলেন। দু'জন অধ্যাপকের কাছে তেরটী ব্যাকরণের ছাত্রের পাঠারম্ভও হ'ল। ফলে একেবারে ফেনিয়ে উঠল দলাদলির হলাহল; দুইদলের মধ্যে বোঝাপড়ার আশাও হ'ল শেষ। হরিদাস বুঝলেন যে এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্ভব নয়। সাত পাঁচ ভেবে তাই তিনি পল্লী মায়ের কোল ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই স্থির করলেন। গন্তব্যস্থল মহানগরী কলকাতা—যেখানে, তিনি ভেবেছিলেন, রুজি-রোজগারের হুলুকসন্ধান মিলতে পারে। যথাসময়ে তিনি পিতার ও অন্যান্য গুরুজনদের অনুমতি নিলেন, পাড়াপড়শীকে রেষারেষি ভুলে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দিলেন এবং নিজের হাতে-গড়া বিদ্যালয়টীকে ছেড়ে কলকাতায় এসে উঠলেন। দলাদলির দৌলতে দুটী বিদ্যালয়ই সেই বছরেই উঠে গেল।

'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়—জীবনীতে' হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যমশায় লিখেছেন—"প্রথম বৎসর ইহার নিকট হইতে বহু ছাত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় গভর্নমেণ্ট হইতে ইনি এক বৎসরের জন্য মাসিক ১২৲ টাকা বৃত্তি এবং এককালীন ২০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।" ডঃ সুশীল রায় ও তাঁর 'মনীষী জীবনকথা' (২১)তে দু'শ টাকা পুরস্কার লাভের কথা বলেছেন। আর্য্যবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় হরিদাস দু'বার সরকারী বৃত্তি পেয়েছিলেন—একবার মাসিক বার টাকা, অন্যবার আট টাকা হারে। এ সব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই পুরস্কার পাবার কথা তাঁর 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তে' আমরা পাই না। 'ঘটনাপঞ্জী'তে তিনি তাঁর আয়-ব্যয়ের পাই-পয়সারও হিসেব রেখে গেছেন। সেখানে এতবড় একটা অঙ্কের উল্লেখ করতে তাঁর ভুল হবে এ কথা মন মেনে নিতে

চায় না। তাই আরও অনুসন্ধান না করে এ সম্পর্কেও সরাসরি কিছু বলে বসা ঠিক হবে না।

নিজের গ্রাম ছেড়ে কলকাতা আসার সন-তারিখ নিয়েও একটু গোলমাল আছে। ডঃ সুশীল রায়, হরিদাসের জবানীতে বলেছেন—"১৩১৩ সনের শেষের দিকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আর্য্যবিদ্যালয় পরিত্যাগ করে উপার্জ্জনের জন্যে কলকাতায় আসি। তখন নিজের ঘরে পাঁচজন ছাত্র রেখে তাদের অধ্যাপনা করছি ও সংসারেও নয়জন পরিজন। এই কারণেই উপার্জ্জনের কথা ভাবতে হ'ল। কলকাতায় এলাম।…" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যমশায়ও ঐ একই কথা বলেছেন। কিন্তু 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত'এ হরিদাস লিখেছেন যে তিনি ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসের প্রথমে কলকাতায় এসেছিলেন। 'ঘটনাপঞ্জী'তে এ এম্পর্কে কিছু লেখা নেই। কিন্তু সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে তিনি "১৩১৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ নকীপুর শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায়চৌধুরী রায় বাহাদুরের বাটী দ্বার পণ্ডিতের পদে ও পৌরহিত্যে নিযুক্ত" হন। কিন্তু তার আগে তিনি কালীঘাটের শ্বশুরবাড়ীতে (৮নং মহামায়া লেন) থেকে নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচার করেছিলেন এবং পেয়েছিলেন সুনাম ও দু'জন বন্ধু। কাজেই মাস দেড়েক (আষাঢ়ের প্রথম থেকে ৩১শে শ্রাবণ) নয়, বেশ কয়েক মাস তিনি কলকাতায় ছিলেন বলেই মনে হয়। সুতরাং ১৩১৩ সনের শেষের দিকেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন এ কথা মেনে নেবার পক্ষেই যুক্তির জোর বেশী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, হরিদাস কোটালিপাড়ায় থাকতে আরও একটী নাটক লিখতে সুরু করেছিলেন—নাম তার 'অচিন্ত্য কৌন্তেয়ং'। মাত্র পাতা নয়েক লিখেছিলেন এবং ন'পাতার পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। পাণ্ডুলিপিটীর নামপত্রে রচনার সন তারিখ লেখা আছে—'শকাব্দাঃ ১৮২৭। আষাঢ়স্য ২২শ দিবসে।' দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নটীর গানের সংস্কৃতানুবাদ দেওয়া আছে। সেটী উদ্ধার করে দিলাম—

"(ক) মন্দমন্দগন্ধবহো বহতি শীতলঃ নদতি কোকিলঃ
পরম সুখে কুসুমমুখে বসতি শ্যামলো মধুপ পেশলঃ
মধুর সৌরভং সতত দুর্লভং
মানসদুঃখহরং চলতি বিবিধং
অমৃতকরঃ শীতলকরঃ ভাসতে নির্ম্মল নভসি মঞ্জুলঃ॥"

এখন আমরা হরিদাসের কলকাতার দিনগুলির কথায় ফিরে যেতে পারি।

নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচারের বিদ্যা তিনি অভ্যাস করেছিলেন পিতার কাছে। সেদিন তিনি অবশ্য অবস্থার ফেরে পড়েই পিতৃদত্ত বিদ্যাকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালেও এই বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ করতে তিনি ভোলেন নি। আমরা যথাসময়ে সে কথার আলোচনা করব। সাময়িকভাবে হরিদাসের জীবনযাত্রার ছক বদলে গেল—অধ্যাপনা এবং বেদান্ত ও দায়ভাগের বিচার ছেড়ে নষ্টকোষ্ঠী ও হস্তরেখা বিচার। কিন্তু তিনি সমান নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গেই এ কাজ করেছিলেন। ফলে তিনি পেয়েছিলেন দু'জন সুহৃদ ও সহায়। তাঁদের সম্পর্কে ডঃ সুশীল রায় বলেছেন—"তাঁরা হচ্ছেন সাউথ সাবার্ব্বন স্কুলের অতুল ঘোষ ও খগেন বসু নামক একজন ব্যবসায়ী। এঁরা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে প্রীত হয়ে হরিদাসের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কালীঘাট বা ভবানীপুরে টোল করে তাতে হরিদাসকে রাখার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।" এবং সেই জন্যেই তাঁরা একদিন খুলনা জেলার নকীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ঘটনাস্রোত গড়িয়ে গেল অন্য খাতে। রায়বাহাদুরের অনুরোধে হরিদাস তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দুদিন দুপ্রস্থ কথাবার্ত্তা হ'ল। প্রথমে রায়বাহাদুর হরিদাসকে শুধু দ্বারপণ্ডিত ও পুরোহিতের পদে বরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপনা না করলে অধীত শাস্ত্রগুলির ওপর অধিকার কায়েম থাকবে কি করে? হরিদাস সে কথা খুলে বললেন জমিদারকে। আর জানালেন যে বেতন হিসেবে তিনি মাসে মাসে টাকা নিতে পারবেন না। রায় বাহাদুর বিচক্ষণ পুরুষ। সব দিক বিবেচনা করে তিনি সব কথাই মেনে নিলেন। স্থির হ'ল যে তিনি নকীপুরে একটী টোল খুলবেন; সেখানে আটজন ছাত্রের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং একটী ভৃত্যসহ সপরিবারে অধ্যাপকের থাকারও বন্দোবস্ত হবে। হরিদাস হবেন টোলের অধ্যাপক এবং তাঁর দ্বারপণ্ডিত ও পুরোহিত। তিনি পাবেন গুরু-পুরোহিতের মর্য্যাদা এবং চল্লিশ বিঘে ধানী জমি ও পনের টাকা হিসেবে মাসিক নির্দ্দিষ্ট দান (বেতন নয়)। হরিদাস খুসী মনে যাত্রার দিন স্থির করলেন। রায় বাহাদুর তাঁকে দিলেন রাহা-খরচের দরুন দশটী টাকা ও নকীপুরের প্রধান কর্ম্মচারীকে লেখা একটী চিঠি। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ হরিদাস নির্বিঘ্নে নকীপুরে উপস্থিত হলেন; সঙ্গে তাঁর তিনটী ব্যাকরণ-পড়া ছাত্র। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এখানেই শেষ হ'ল বলা যেতে পারে।

॥ চার ॥

যুবক হরিদাসের ভালই লেগেছিল নকীপুর। গ্রামের রাস্তাঘাট বেশীর ভাগই পাকা। হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও কবিরাজের ঔষধালয় এবং পোষ্টাফিস ইত্যাদি সব কিছুই ছিল সেখানে। ক্রমে তিনি দেখলেন ও জানলেন যে নকীপুরের মাইল খানেক দক্ষিণে হ'ল একান্ন মহাপীঠের একটি পীঠ, 'যশোহর', —মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। 'আশ্রমসদৃশ' টোল বাড়ীটী তাঁর খুবই মনে ধরেছিল। শুতেন অবশ্য তিনি বিশাল টোল ঘরে এবং রান্নাবাড়াও নিজেরাই করে নিতেন। এ সব কষ্ট তিনি মোটেই গায়ে মাখতেন না। বরং নিজের ও পরিজনবর্গের জন্যে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করতে পেরে তিনি প্রসন্নমনে নিজেকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার কাজে বিনিয়োগ করে দিলেন। তাঁর কাছে অধ্যাপনা মোটেই মামুলী ব্যাপার ছিল না। পরিশ্রমী ও যত্নশীল অধ্যাপক ত তিনি ছিলেন বটেই। তাছাড়া ছাত্রেরা যাতে নিজের নিজের বক্তব্য কথায় ও কালিতে সুন্দর করে পরিবেশন করতে পারে সেদিকেও তাঁর নজর ছিল ; তিনি শেষ বেলায় সকল ছাত্রকেই রচনা ও বক্তৃতার বিষয় শিক্ষা' দিতেন। যথাসময়ে শারদীয়া দুর্গাপূজার শুভলগ্ন এসে গেল। হরিদাস বসলেন পূজকের আসনে এবং তারই ছাত্র হরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ তন্ত্রধারক। তাঁর সে সর্বাঙ্গ সুন্দর পূজায় সকলে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফলে তিনি পেয়েছিলেন সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা এবং দেবীর আশীর্ব্বাদ। (জগদ্ধাত্রী পূজাও তিনিই সুসম্পন্ন করেছিলেন)। কার্ত্তিক মাসের শেষে তিনটী ছাত্রকে নকীপুরে রেখে তিনি ঊনশিয়ায় চলে এলেন। সেই ফাঁকে টোলঘরের গা-বরাবর অধ্যাপকের সপরিবারে থাকার মত ঘর-বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তিনি স্ত্রী, চারজন ছাত্র ও একটী বৃদ্ধ ভৃত্যকে নিয়ে নকীপুরে ফিরে এলেন। নকীপুরের আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে আরও চারজন ছাত্র এসে জড় হল—টোলবাড়ী জমজমাট হয়ে হয়ে উঠল। তারপর সরস্বতী পূজা। বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে অধ্যাপক ও ছাত্ররা বাণীবন্দনায় মিলিত হলেন। সেই সঙ্গে সভা করে সবাই মিলে টোলটীর নাম রাখলেন—'হরিচরণ চতুষ্পাঠী'। রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর নিজেই টোলটী গড়েছিলেন। সে টোলের নাম যদি তিনিই সরাসরি 'হরিচরণ চতুষ্পাঠী' রাখতেন,

তাহলেও কারুর কিছু বলার থাকত না। কিন্তু গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় মিলিত হয়ে নামকরণের মধ্যে যে স্বীকৃতি ও সম্মান আছে, তা তিনি পেতেন না। ক্রমে দোল ও বাসন্তীপূজা একে একে চলে গেল—পৌরোহিত্য করলেন হরিদাস। নকীপুরে নবাগত হরিদাসকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে ১৩১৪ সাল বিদায় নিল।

১৩১৫ সাল; কর্ম্মযোগী হরিদাসের সাধনার পর্ব্বারম্ভ। সময় ও পরিবেশ অনুকূল। হরিদাস সারা দিনমান কর্ম্মমগ্ন। সেদিনের কথা তিনি তাঁর 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত'এ বলেছেন—"আজিও প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া প্রথমে ৭টা হইতে পূর্ব্বারব্ধ 'রুক্মিণীহরণ' মহাকাব্য রচনা করিতাম, সেই সময়ে ছাত্রগণ আবৃত্তি করিত, পরে ৮টা হইতে দর্শন ও স্মৃতির ছাত্রগণকে পড়াইতাম, ১১টার সময় মধ্যাহ্নস্নান, সন্ধ্যা ও পূজা করিয়া প্রথমে আহারান্তে পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যাকরণ ও কাব্যের ছাত্রদিগকে পড়াইয়া শেষবেলায় সকল ছাত্রকেই রচনা ও বক্তৃতার বিষয় শিক্ষা দিতাম। পরে আগত লোকদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম বা একটু বেড়াইতাম, তৎপরে টোলে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিয়া পরদিন রচনা করার বিষয় চিন্তা করিতাম, তাহার পর আহার করিয়া নিদ্রা যাইতাম'।*** দূরে সভায় বা নিমন্ত্রণে যাইতে হইত না; সুতরাং সময় যথেষ্ট পাওয়া যাইত। অতএব প্রত্যহই যথানিয়মে রচনা করার কোনই বাধা হইত না।..." এই 'যথানিয়মে রচনা করার' অভ্যাস অর্থাৎ নিয়মনিষ্ঠাই তাঁর সাধনার বীজমন্ত্র। একমুখে স্মৃতি, দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করেও তিনি ক্লান্ত হতেন না। বেলাশেষে সব ছাত্রকেই লেখা ও বলার অভ্যাস করাতেন। সূর্য্যাস্তের পর অবসর, কর্মক্ষান্তি। ১৩১৫ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ চলে গেল—আষাঢ় এল, সঙ্গে সুসংবাদ। যে চারটী ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল তারা সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘটনাপঞ্জীতে দেখা যায় যে ঐ চারিটী ছাত্রের মধ্যে দু'জন পশ্চিমপাড়ের, একজন গৈলার ও আর একজন বাদলকাটীর ছেলে। দু'জনের পরীক্ষার বিষয় ব্যাকরণ, একজনের বেদান্ত এবং অন্যজনের মীমাংসা। ছাত্রদের সাফল্যের দরুন মাসিক আট টাকা হারে সরকারী বৃত্তিও তিনি পেয়েছিলেন। ১৩১৫ সাল অতিক্রান্ত হ'ল। ১৩১৬ সালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল 'রুক্মিণীহরণ'এর রচনার সমাপ্তি। মহাকাব্যেরই শেষ সর্গের (ষোড়শ সর্গের) সব শেষের আগের শ্লোকের শেষ পংক্তিতে কবি নিজেই বলে গেছেন যে 'চন্দ্রাগ্নিনাগবিধুমানশকাব্দ মাঘে' অর্থাৎ ১৩১৬ সনে (১৩৮১ : ১৮৩১ শকাব্দ : ১৮৩১—৫১৫) তিনি এই মহাকাব্যটীর রচনা শেষ করেছিলেন।

আরও প্রমাণ আছে। পাণ্ডুলিপির শেষ পাতায় হরিদাস তাঁর অভ্যাসমত সন তারিখ লিখে রেখে গেছেন—‘১৩১৬ সাল, ১২ই ফাল্গুন, প্রাতঃ—’। এই পাতাটীর প্রতিলিপিও দিয়ে দিলাম। যাঁরা পাণ্ডুলিপির মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পান বা ‘তার স্রষ্টাদের ব্যক্তিসত্তার জীবন্ত স্পর্শ’[1] অনুভব করেন তাঁরা প্রতিলিপিটী দেখে ‘তক্রে কিঞ্চিৎ দুধের স্বাদ’ পেলেও পেতে পারেন।

‘রুক্মিণীহরণে’র সঙ্গে আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। মহাকাব্যটী ষোলটী সর্গে লেখা। রসিক পাঠকেরা পঞ্চদশ সর্গে—পদ্মবন্ধঃ, লতাবন্ধঃ, বৃক্ষবন্ধঃ ইত্যাদি শ্রেণীর কয়েকটী চিত্রালঙ্কারও পাবেন। সপ্তমসর্গে প্রখর-তপন-তাপিত দ্বিপ্রহরের একটী সুন্দর চিত্রময় বর্ণনা আছে—সংস্কৃত সাহিত্যে যা একান্তই বিরল। খণ্ড চিত্রকাব্যটীতে সূর্য্য. অন্ধকার, জল, বায়ু, বালি, বাষ্প, বৃক্ষ, বৃষ, মাঝি-মাল্লা চাষী, পথিক, গৃহবধু ইত্যাদি সবকিছুও সকলেই রেখাঙ্কিত হয়েছে। একটী শ্লোক এখানে তুলে দেওয়া হ’ল.—

“দীর্ণভূবিলমুপেত্য ভাস্করঃ
ধ্বান্তশেষমিব হন্তুমুদ্যতঃ
নাগলোকমগমদ্বিচক্ষণঃ
নাশ্যলেশমপি নৈব শেষয়েত্ ॥৫৩॥”

“সূর্য্য বিদীর্ণভূমির গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট অন্ধকারও যেন বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া পাতালে যাইতেছিলেন। কারণ, নীতিজ্ঞ লোক হন্তব্যের লেশও অবশিষ্ট রাখেন না।”

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা সারস্বত সমাজের ১৯৩৩—৩৪ সালের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে (কলিকাতার) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশকে এই মহাকাব্যটির জন্যে ‘শ্যামাসুন্দরী’ পুরস্কার * দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারের অঙ্কটা অবশ্য মাত্র ১৪ টাকা, কিন্তু তার সম্মানমূল্য ছিল অনেক। বইটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে। এবং প্রায় ৪০ বছর আগে বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন্ তথা বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কাব্যের মধ্যপরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপেও এই মহাকাব্যখানি নির্ব্বাচিত হয়েছিল। সে নির্ব্বাচন হয়েছিল অবশ্য দারুণ মতভেদের মধ্যে।

এই ১৩১৬ সালেই হরিদাস "স্মৃতিচিন্তামণি' প্রণয়ন করেন। বইটীর দ্বাদশ পরিচ্ছেদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে হরিদাস নিজেই লিখে গেছেন—

"জানকীবিক্রমং তেন নাটকং বীররৌদ্রবৎ।
নাটিকামুজ্জ্বলরসাং শ্রীবিরাজসরোজিনীম ॥৩॥
বিয়োগবৈভবং নাম খণ্ডকাব্যং বিধায় চ।
কুর্ব্বাণেন মহাকাব্যং রুক্মিণীহরণাভিধম্ ॥৪॥
শশিরামগজেন্দুমে শকে স্মৃতিচিন্তামণিরাপ পূর্ণতাম্।
নভসীষুধরামিতে দিনে বিহিতঃ শ্রীহরিদাস শর্ম্মণা ॥৫॥

"(সেই হরিদাসশর্ম্মা, বীর ও রৌদ্ররস সমন্বিত 'জানকীবিক্রম' নামে নাটক, শৃঙ্গাররসান্বিত 'বিরাজসরোজিনী' নামে নাটিকা এবং 'বিয়োগবৈভব' নামে খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া, 'রুক্মিণী হরণ' নামে মহাকাব্য রচনা করিবার সময় 'স্মৃতিচিন্তামণি' প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থ ১৮৩১ শকাব্দের ১৫ই শ্রাবণ সম্পূর্ণ হইল ৩॥৪॥৫॥)"

আগেই আমরা দেখেছি যে পাণ্ডুলিপির লেখামতে 'রুক্মিণীহরণ' রচনা সমাপ্তির দিন হ'ল, ১২ই ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল। আর 'স্মৃতিচিন্তামণি'র রচনা শেষ হয়েছিল ১৩১৬ সালের (১৮৩১ শকাব্দের) ১৫ই শ্রাবণ। অর্থাৎ বই দুটীর রচনা একই সঙ্গে চলেছিল ও শেষ হয়েছিল ১৩১৬ সালে। কিন্তু কোনটীর রচনা আগে শেষ হয়েছিল সে বিষয়ে একটু সংশয় থেকে যায়।

'বিরাজসরোজিনী' হরিদাসের প্রথম ছাপা বই। বইটীর দুটী সংস্করণ হয়েছিল।

তারপরই আসে 'স্মৃতিচিন্তামণি'র পালা। হরিদাস এ বিষয়ে ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—

"১৩১৭ সাল ২৮শে শ্রাবণ বিরাজসরোজিনী নাটিকা ১০০০ কপি গুরুনাথ কাব্যতীর্থ দ্বারা ছাপাইয়া নেওয়া হইল। উহার ব্যয় মোট একশত চার টাকা নয় আনা পড়িল।

১৩১৯ সাল ২রা বৈশাখ স্মৃতিচিন্তামণি ১০০০ কপি হইল। উহার ব্যয় মোট তিনশত সাতান্ন টাকা দুই আনা পড়িল।"

'বিরাজসরোজিনী' নাটিকাটী আগাগোড়া দেবনাগর হরফে ছাপা—পাতার সংখ্যা একানব্বই। 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' বাংলা হরফে ছাপা একটী তিনশ একাত্তর

পাতার বই। আজকের দিনের নবীন প্রকাশকদের কাছে সেদিনের বই ছাপার খরচের অঙ্কটা অবিশ্বাস্য রকমের কম বলেই মনে হবে।

'স্মৃতিচিন্তামণি' স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ক তত্ত্ব সমূহের সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত সরল সংগ্রহ। ব্রত, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপনয়নাদি সংস্কার, পূজা, দায়ভাগ ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রসম্মত বিধান এতে আছে। ভাষা সরল. বিশেষ করে বাংলা অনুবাদের। তাই সেদিন পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই বইটীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; ফলে বইটীর চারটী সংস্করণও দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশ্য 'সকলেই' মানে শাস্ত্রীয় অনুশাসন যাঁরা মেনে চলেন বা চলার চেষ্টা করেন তাঁদের কথাই বলছি। ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে—"১৩১৯ সনের ২৬শে পৌষের হিতবাদীতে স্মৃতিচিন্তামণির বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইল।—'এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি…' এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।"

একাদশীর উপবাস যে সমস্ত বিধবারা পুরোপরি পালন করতে অক্ষম তাঁরা কি করবেন? তাঁদের পক্ষে অনুকল্প (অন্ন ব্যতীত অন্য খাদ্য) গ্রহণ করা শাস্ত্রবিহিত কি না? প্রশ্নগুলি সেদিনের শাস্ত্র-শাসিত সমাজকে রীতিমত আলোড়িত করেছিল। সেদিনকার সেই বাদানুবাদের মধ্যে যাবার আজ আর আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই; তাছাড়া আমার সে অধিকারও নেই। তবুও সেদিন হরিদাস কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টীর বিচার করেছিলেন তা জানার কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। ১৩১৯ সালে প্রকাশিত 'স্মৃতিচিন্তামণি'তে লিখেছেন—

" 'বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে;
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥'
ন চ অমুনা বচনেন বিধবানামনুকল্প নিষেধ ইতি বাচ্যম্। (ব)
'অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি!।'

ইতি নারদীয় বচনস্য অকারণ সঙ্কোচপত্তেঃ। যুক্তি প্রমাণান্তরস্তু গ্রন্থ গৌরবপরিজিহীর্ষয়া পরিহৃতম্ (১)। অতো বিধবাকষ্টে নষ্টদৃষ্টিনাম নিষ্করুণদারুণানাং কিঞ্চিদত্রাবধাতব্যম্। (শ)"

(ব) উক্ত বচন দ্বারা বিধবাগণের পক্ষে ফলমূলাদি আহাররূপ অনুকল্প নিষিদ্ধ হইল অর্থাৎ বিধবাগণ একাদশীর উপবাসের দিনে ফলমূলাদিও খাইবে না, ঐরূপ বলা যায় না। কারণ—

(শ) 'হে বরবর্ণিনী! ক্ষীণ (উপবাসে অসমর্থ) মানবগণের পক্ষে অনুকল্প বলা হইয়াছে অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ হইলে অন্ন ব্যতীত খই প্রভৃতি আহার করা যাইতে পারে।'

এই নারদীয় বচনের মুখ্যার্থবাধ প্রভৃতি লক্ষণার কারণ না থাকা সত্ত্বেও, সঙ্কোচরূপ লক্ষণা হইয়া উঠে অর্থাৎ নারদবচন বিধবা ভিন্ন অসমর্থ লোকের পক্ষে, এই কথা বলিতে হয়; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গে উপবাসে অসমর্থ বিধবাদের দুগ্ধপান প্রভৃতি প্রচলিত আছে। ইহার অন্য যুক্তি ও প্রমাণ পরিত্যক্ত হইল। কারণ, তাহাতে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি হয়। অতএব যাঁহারা বিধবাদের কষ্ট দেখেন না অর্থাৎ বিধবাগণ উপবাসে অশক্তি নিবন্ধন মৃতপ্রায় হইলেও জলটুকুমাত্র খাইতে ব্যবস্থা দেন না. এইরূপ নির্দ্দয় ভীষণ-প্রকৃতি পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা উচিত।,

হরিদাস এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় 'বিধবার অনুকল্প' নামে পুস্তিকাটীর উল্লেখ করেছেন। এটি প্রথম·প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে (১৩২৮ বঙ্গাব্দে)। এখানে হরিদাস তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত পেশ করার সাধ বা সাধ্য আমার নেই। তবে তার পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা, তথ্যনিষ্ঠা, তথ্যসজ্জা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যুক্তি শৃঙ্খলা এবং প্রয়োগনৈপুণ্য আমাদের অভিভূত করে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর সাধক প্রমাণের প্রথম যুক্তিটি নীচে তুলে দিলাম—

১। "বেদ—'আত্মানং সততং গোপায়ীত'—(সর্ব্বদাই আত্মরক্ষা করিবে) এই বেদবাক্যে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মৃত্যু—সম্ভাবনাস্থলে, যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মৃত্যু নিবারিত হয়, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও সেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সম্ভাব্যমান সেই মৃত্যু নিবারিত করিবে।…প্রত্যুত অনুকল্প গ্রহণ না করার জন্য মৃত্যু হইলে আত্মহত্যারই পাপ হইবে এবং ব্যবস্থাপকও তাহার নিমিত্তী হইবেন। অতএব অসমর্থ বিধবাদিগের একাদশীতে অনুকল্প গ্রহণ করা বেদানুমোদিত।…"

হরিদাস মূলতঃ কবি। তাই তাঁর শেষ ও সব থেকে জোরালো আবেদন

---

(১) অস্মৎ প্রণীত "বিধবার অনুকল্প" নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তার দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতদের 'শাস্ত্রীয় দয়া'র এবং সহৃদয় 'বিবেচনা'র প্রতি। তাঁর সহৃদয়তা ও যুক্তি সেদিন বিফলে যায় নি বলেই মনে হয়। তাহলে 'বিধবার অনুকল্পে'র মত একটি বার পাতা বই-এর আর দু'দুটো সংস্করণ বের হত না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় 'সরলাস্মৃতিঃ' নামে একটি অমুদ্রিত বই-এর পাণ্ডুলিপি আছে। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ এবং তাতে রচনাকালও লেখা নেই। এই অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রন্থটির নামকরণে, প্রথমা স্ত্রী সরলাসুন্দরীর স্মৃতি হরিদাসকে আদৌ প্রভাবিত করেছিল কি না কে জানে। কিন্তু এটি যে 'স্মৃতিচিন্তামণি'র একটি খসড়া একথা অনুমান করা একান্ত অসঙ্গত হবে না। গ্রন্থদুটিরই প্রথম চারটি শ্লোকের মধ্যে ভাবে ও ভাষায় যথেষ্ট মিল আছে। প্রথম শ্লোকটি ত একেবারেই এক বললেই হয়,—শুধু 'সরলাস্মৃতি'র 'শিবানী' 'স্মৃতিচিন্তামণি'তে হয়েছেন 'ভবানী' এবং 'গৌর' হয়েছে 'দীপ্ত'। ছন্দলালিত্যে, ও অর্থসম্পদে শ্লোকটি বড় সুন্দর। তাই সেটি নীচে লিখে দিলাম। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে হরিদাসের মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি পর পর সাজিয়ে নিলেই তাঁর উপাস্য দেবতা শঙ্করের একটি সুন্দর স্তবমালা হয়ে যাবে।—

"শশধরকরধারাধৌত সম্বর্দ্ধিতশ্রীঃ
স্বতনুগতভবানীপাণি সংসক্তকণ্ঠঃ।
ধৃতশশিমণিবিদ্যুদ্দীপ্ত কৈলাসকল্পঃ
বিতরতু চিরকালং বঃ শিবং শ্রীশিবঃ সঃ ॥১॥"

১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকামিনীর প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি নিরাসক্ত ভঙ্গীতেই ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"১৩১৬ সালে ১০ই ভাদ্র বেলা অনুমান দেড়টা ১৯ দং ১৫ পলের সময় আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকামিনীর প্রথম শুভ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বৃশ্চিকলগ্ন হইবার সম্ভব। মূলা নক্ষত্র, ধনুরাশি।" পরের মাসেই ঘটেছিল সেই 'চির-চিন্তনীয়া' ঘটনা—আশ্বিনে ঝড়। এই ঝড়ের রুদ্রলীলা হরিদাসের কবি মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই হ'ল 'সরলা' রচনার শুভারম্ভ—১৩১৬ সালে। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ বছর। মাঝে চুয়াল্লিশ বছর কেটে গেল অন্য কাজে: বইটি যখন শেষ হ'ল তখন তাঁর বয়স সাতাত্তর। এ সব কথা প্রথাসিদ্ধ-ভঙ্গীতে তিনি 'সরলা'র শেষ শ্লোক দুটিতে বলে গেছেন। ঝড়ের সংহারমূর্ত্তির একটি রেখাচিত্র আমরা পাই ঘটনাপঞ্জীতে। সেখান থেকে কিছুটা তুলে দিলাম।

সংস্কৃত-পণ্ডিতের লেখা গতিপ্রাণ বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবেও ঘটনাপঞ্জীর এই অংশটুকুর বিশেষ মূল্য আছে।—

"১৩১৬ সাল ৩১শে আশ্বিন বেলা ৯টা হইতে ঝর (ঝড়) আরম্ভ হইয়া উহা সন্ধ্যার পর হইতে ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাত্রি ৯/৯৷৷০টার সময় হইতে ঐ ঝড়ে ঘর, বড় বড় গাছ, লতা প্রভৃতি উপর্য্যুপরি পড়িতে থাকিল, শব্দে কানে কিছুই শুনা গেল না। কেবল 'শোঁ-শোঁ' দারুণ শব্দ; ঘর ও গাছ পড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে লোকের আর্ত্তনাদ। প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় জল প্রায় দেড় হাত বাড়িল। টোলের ঘর হইতে ছাত্রগণ ভয়ে পশ্চিমের ঘরে আসিল। কিছু কাল থাকিয়া ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেশী দেখিয়া ও ঘর এখনই পড়িবে এই আশঙ্কা করিয়া '৺দুর্গা ২' বলিয়া বাবুর বাটীর দিক ছাত্রগণসমেত চলিয়া টোলবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া চোখে নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত দেখা গেল না, সম্মুখে এত গাছ পড়িয়াছে যে, সদররাস্তায় বাহির হইবার কোনরূপেই সম্ভাবনা নাই, এ দিকে গায়ের উপর যে বৃষ্টি পড়িতেছে তাহা যেন বাণের মত বিদ্ধ হইয়া আগুনের মত বোধ হইতে লাগিল এবং এক পরদা চামড়া যেন উঠিয়া যাইতে লাগিল।…" পাশাপাশি 'সরলা' থেকে 'বাত্যা'র বর্ণনার অংশ বিশেষও দিয়ে দেওয়া হ'ল।—

"অথ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর প্রথম সময়ে যুগপদেব প্রাদুরভূদতিভীষণো বায়ুবেগঃ, মুসলপ্রমাণা বর্ষধারা, পাণিগ্রাহ্যমতিনিবিড়মন্ধকারঞ্চ। তত্র চ অনবরতমতিমহীয়ান্ বায়ুকোণাগতঃ শোঁ শোঁ শব্দঃ বধিরীকুর্ব্বন্ কর্ণবিবরম্, আকুলীকুর্ব্বন্ পল্লীজনম্, হতাশীকুর্ব্বন্ প্রাণিহৃদয়ম্, পরিত্যাজয়ন্ জীবনাশাম্, নিপাতয়ন্ অশ্রুজলং প্রসসার।·"

এমন সরল ধ্বনিময় বর্ণনা পড়ার পর সংস্কৃত গদ্যকে কি 'বিষমকঠিনা' বলে বিশেষিত করা যায়?

গদ্যকাব্যটীর পরের ঘটনা 'অনিন্দসুন্দরী' সরলার বিপত্তি, উদ্ধার ও পরিণয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এখানে আর একবার আমাদের মনে করা দরকার যে হরিদাসের প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিল 'সরলা'। মৃত্যুপথযাত্রী বালিকা-বধূকে তিনি শেষ দেখাও দেখতে পান নি। কর্ম্মযোগী ছিলেন তিনি—স্ত্রী বিয়োগ ব্যথার বিশেষ কোনো বিবরণ তিনি কোথাও লিখে যাবার সময় করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু অষ্টাদশী সরলাসুন্দরীর স্মৃতি তাঁর কবি মনে হয়ত রঙে রসে চিরদিনের মতই আঁকা ছিল।

'সরলা' সম্পর্কে আর একটী কথা বলার আছে। বইটী পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত

সমাজে পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

১৩১৬ সালের আরও একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল হরিদাসের ঋণমুক্তি। ঘটনাপঞ্জীতে তিনি সংক্ষেপে লিখেছেন সে-কথা—"...(১৩১৬ সনের) ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত পিতৃদেবের হিসাব মত ১৩৪ টাকা পরের কর্জ্জ শোধ দেওয়া হইল।" বন্ধকী সোনাদানা, খত ইত্যাদি সব কিছু তিনি খালাস করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বচ্ছলতার মুখও দেখতে পেলেন—হাতে তাঁর টাকা জমতে লাগল। সেই বাড়তি টাকা তিনি দফায় দফায় পোষ্টাফিসে জমা করে চললেন ও ঘটনাপঞ্জীতে তা লিখে রাখলেন। কিন্তু ঋণমুক্ত হলেও ঋণাতঙ্ক থেকে তিনি কখনও মুক্তি পান নি। সারা জীবনভোর তিনি হিসেব করে চলেছেন ও হিসেব রেখে গেছেন। 'সর্ব্বথানর্থমূলং ধর্ম্মধ্বংসী' (বিত্তাবিত্তবিবাদম্) হলেও অর্থ প্রয়োজনীয়–এ শিক্ষা তিনি দারিদ্র্যের পাঠশালায় পড়েই পেয়েছিলেন। 'অন্নচিন্তাচমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ'—এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের আংশিক সত্যতাও হয়ত তিনি মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কর্ম্মে ও কীর্ত্তিতে ভরা ১৩১৬ সন চলে গেল। ১৩১৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সনের ৯ই বৈশাখ পর্য্যন্ত হরিদাস নকীপুরে ছিলেন। অনেক রচনা ও ঘটনা হরিদাসের জীবনকথায় নকীপুরকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে। মহাকাব্য ও ব্যবস্থাগ্রন্থটীর কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার আমরা সংক্ষেপে তার পরের কথাগুলি উল্লেখ করে এগিয়ে চলে যাব হরিদাসের সাধনার সিদ্ধিপীঠে—কলকাতায়। নকীপুরে লেখা তাঁর টীকা ও অনুবাদ-গ্রন্থগুলির বিস্তারিত আলোচনা অনিবার্য্য কারণেই এখানে সম্ভব নয়। তবে যাঁরা তাঁর অনুবাদকর্ম্মের কৌশল ও কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় পেতে চান, তাঁরা 'কাদম্বরী' পড়ে দেখতে পারেন।

১৩১৭ সনের গোড়াতেই (২৮শে শ্রাবণ), তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বিরাজসরোজিনী' যখন মুদ্রণাগারের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিল, তখন তিনি নকীপুরে। ১৩১৭ সনে রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুরের বিমাতা নিস্তারিণী দেবীর শ্রাদ্ধে ও ১৩২১ সনে রায়বাহাদুরের শ্রাদ্ধে হরিদাস অধ্যক্ষ ও পুরোহিতের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। দুজনের বেলাই 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণাস্বরূপ তিনি মোট পেয়েছিলেন হাজার খানেক টাকার কিছু বেশী (৪৭০টাঃ ১৪আঃ ২পঃ+৫২৫টাঃ—ঘটনাপঞ্জী) এবং দু'বারই ষোড়শে ন বিঘে করে জমি। সরস্বতী ত চিরকালই তাঁর প্রতি প্রসন্ন;

এবার লক্ষ্মীও মুখ তুলে চেয়েছেন। এর মধ্যে ১৩১৯ সনের সেই শুভলগ্ন এসেছে—যেদিন রবীন্দ্রনাথ জগৎকবির সভায় পেলেন সম্মানের আসন ও অর্থ, নোবেল পুরস্কার। বাংলা ত বটেই, সারা ভারতবর্ষই সেদিন গৌরবে ও আনন্দে উছলে পড়েছিল। নকীপুর এমন কিছু দূরবিদেশ নয়। হরিদাস কলকাতায় আসা-যাওয়াও করতেন এবং খবরের কাগজ, দেরীতে হলেও, নকীপুরে বসেই তা তিনি পেতেন। কাজেই এ সুসংবাদ তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু 'রুক্মিণীহরণে'র কবির মনে 'গীতাঞ্জলি'র কবির এই বিশ্বজোড়া সম্মান ও স্বীকৃতি কি রেখাপাত করেছিল, তা আমরা জানতে পারি নি। তিনি তখন 'স্মৃতি-চিন্তামণি'র অনুকূল সমালোচনায় ও সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন সংস্কৃতগ্রন্থের টীকা ও বাংলা অনুবাদ করে চলেছেন। সেগুলি কলকাতা থেকে ছাপিয়ে প্রকাশ করার ব্যবস্থাও করছেন। বইগুলি ছাপার দিন, তারিখ ও খরচা সম্পর্কে ঘটনাপঞ্জীতে যা পাওয়া যায় তা তুলে দিলাম। এ সব খুঁটিনাটি অনেকেরই হয়ত কাজে লাগবে না; কিন্তু সব কথা যাঁরা খুঁটিয়ে জানতে চান এমন পাঠকও ত আছেন।—

"১৩২০ সাল ১১ই আশ্বিন মালবিকাগ্নিমিত্র (কালিদাসকৃত নাটক) ১০০০ (হাজার) ছাপা শেষ হইল। উহার ব্যয় মোট বিজ্ঞাপন সমেত ৩০৮টাঃ ৬আঃ ১পঃ।"

"১৩২০ সাল ৭ই মাঘ উত্তররামচরিত (ভবভূতিকৃত নাটক) ১০০০ (হাজার) ছাপা শেষ হইল। বিজ্ঞাপন সমেত উহার মোট ব্যয় ৪৩২ টাঃ…"

"১৩২১ সাল ১৭ই অগ্রহায়ণ মালতীমাধব (ভবভূতিকৃত প্রকরণ) ১০০০ (হাজার) ছাপাইয়া আনা হইল। মোট খরচ ৫৫২টাঃ ২আঃ"

"১৩২১ সালের ২৯শে চৈত্র দশকুমারচরিত (দণ্ডাচার্য্যকৃত গদ্যকাব্য) ১০০০ ছাপাইয়া আনা হইল। মোট খরচ ২৯৯টাঃ ৯আঃ"

"১৩২৩ সালের ২৩শে শ্রাবণ কাদম্বরী (পূর্ব্বার্দ্ধ—বানভট্টকৃত গদ্যকাব্য) ১০০০ মেটকাফ হইতে ছাপা হইয়া আসিল। খরচ বিজ্ঞাপন সমেত মোট—১৬৬২টাঃ ২আঃ ৩পঃ"

"১৩২৬ সাল ৩০শে বৈশাখ সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ) আমার কৃত টীকা সমেত মেটকাফ্ প্রেস হইতে ছাপা হইয়া আসিল।* ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মা ৮টাঃ হিঃ ছাপাই কার্য্য। কাগজ ২২ ও ২৪ পাউণ্ডী

---

* 'সাহিত্যদর্পণে'র টীকার সঙ্গে বঙ্গানুবাদ নেই।

৯টাঃ ২আঃ হইতে ১২টাকা পর্য্যন্ত রীম্‌। মোট খরচ ১৪০৩টাঃ ১পঃ পড়িল।” সাহিত্যদর্পণের টীকাটীর নাম ‘কুসুমপ্রতিমা’। হরিদাসের দ্বিতীয়া স্ত্রীর স্মৃতি-সুরভিত এই নামটী বড় স্নিগ্ধ ও সুন্দর। আমরা আগেই জেনেছি যে তাঁর নাম ছিল শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী।

“১৩২৭ সাল ১৮ই আশ্বিন মেঘদূত (কালিদাসকৃত কাব্য) [আমার কৃত চঞ্চলা টীকা, বঙ্গানুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ এবং মল্লিনাথের টীকা এবং পাঠান্তরাদি সহ] ছাপা হইয়া আসিল। সংখ্যা হাজার। কলিকাতা ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন ‘ঘোষ প্রেসে’ ছাপা হইল। প্রথম ৮ ফর্ম্মা প্রুফ দেখা সহ ৮টাঃ করিয়া, পরের ৭ ফর্ম্মা ৯টাঃ করিয়া, কাগজ বিলাতী ২৪ পাউণ্ড আইভরি ডবল ক্রাউন। মোট খরচ ৪১৬টাঃ ১৪আঃ ২পঃ।”

“১৩২৭ সাল ১৮ই আশ্বিন মালতী-মাধবের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়া আসিল। (আমার কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) সংখ্যা হাজার। কলিকাতায় ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন ‘ঘোষ প্রেসে’ ছাপা হইল। প্রথম ৮ ফর্ম্মা ৮টাঃ করিয়া পরে ১৮ ফর্ম্মা ১০টাঃ করিয়া এবং তৎপরে ১০টাঃ ৮আঃ করিয়া। কাগজ দেশী ২২ ও ২৪ পাউণ্ড এণ্টিক প্রভৃতি ডবল ক্রাউন। মোট খরচ ৯৪১টাঃ ৫আঃ।”

বই ছাপার খরচ খরচার যে হিসেব আমরা পেলাম তা এখন অবিশ্বাস্য রকমের কম বলেই মনে হয়। কিন্তু তখন হরিদাসের কাছে খরচের অঙ্কটা মোটেই কম বলে মনে হয় নি। তিনি বুঝে দেখলেন যে নকীপুরে থেকে কলকাতায় বই ছাপালে শুধু খরচাই অনেক বেশী নয়, অসুবিধাও হরেক রকমের। তাই তিনি স্থির করলেন যে নকীপুরেই একটি ছাপাখানা বসাবেন। ব্যাপারটা সোজা নয়—ছাপাখানা ও তার সাজসরঞ্জাম কলকাতা থেকে নকীপুর নিয়ে যেতেই ত ঢাকের দায়ে মনসা বিদেয় হবার যোগাড় হবে। তাছাড়া ঝক্কি-ঝামেলাও ত কম নয়—সরকারী অনুমতি চাই, প্রেসের জন্যে একটা বড় ঘরও দরকার, তারপর প্রেস চালাবার মত উপযুক্ত কম্পোজিটার, প্রেসম্যান ইত্যাদি ত আর নকীপুরে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু কাজে নেমে পিছিয়ে পড়ার ধাত নিয়ে হরিদাস জগতে আসেন নি। তাঁর মনোবল ও কর্ম্মশক্তির কাছে হার মেনে বাধা বিপত্তি যা ছিল সব মাথা নীচু করে পথ ছেড়ে দিল; ১৩২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ নকীপুরের টোলবাড়ীর সামনে নতুন এক ঘরে প্রেস বসে গেল। কলকাতার একজন কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান স্থানীয় ব্রাহ্মণযুবকদের প্রেস চালাবার কাজে

তালিমও দিলেন। দু'চার দিনের মধ্যেই প্রেস চালু হয়ে গেল। গোড়ার দিকে গ্রামবাসীরা নিশ্চয় দলবেঁধে দেখতে এসেছিলেন যে কী কৌশলে একটি সামান্য যন্ত্র গড়গড় করে পুঁথিপত্তর সব ঝক্‌ঝকে হরফে ছেপে ফেলে যা লিখতে বা নকল করতে পণ্ডিতদের লেগেছিল অনেক সময় এবং স্বীকার করতে হয়েছিল অশেষ কষ্ট। প্রেস বসাবার সন তারিখ ও খরচার খুঁটিনাটি সব কিছুই আমরা পাই হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীতে। বর্ত্তমানে যাঁরা প্রেস চালান বা প্রেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, বিশেষ করে তাঁদের কাছেই এ সব খবর পৌঁছে দিলাম—

"সন ১৩২৬ সালের পৌষ মাস হইতে অনবরত চেষ্টা করিয়া ১৩২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে প্রেস স্থাপন করা হইল। ১৩২৬ সালের ২৬শে ফাল্গুন কলিকাতা সঞ্জীবনী অফিস হইতে একটী পুরাতন উৎকৃষ্ট সুপার রয়াল সাইজের কলম্বিয়ান প্রেস কেনা হয়; উহার মূল্য চারিশত টাকা। উহা খোলাইয়া নকীপুর আনা ও তোলা পর্য্যন্ত ব্যয় ৪২৯টাঃ ১২আঃ ৩পঃ। (এই প্রেসটী সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের বাড়ীতে এখনও আছে।)

১৩২৭ সালের ২৩শে বৈশাখ কলিকাতা ২৩নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন শ্রীযুক্ত তারক সিংহের নিকট হইতে নাগরী স্মল পাইকা টাইপ খরিদ: ১ মণ ২৬ সের ৫ ছটাক।

১৩২৭ সালের ২৩শে বৈশাখ কলিকাতা ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন রক্ষিত ফাউণ্ড্রী হইতে নাগরী গ্রেট ১ মণ, পাইকা ১ মণ, লং প্রাইমার ১ মণ ২০ সের, বাঙ্গলা ইংলিশ ১ মণ, এবং স্মল পাইকা ২ মণ ২০ সের কেনা হয়। (অপর খবর, হিসাবের বইতে)।"

১৩২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ নকীপুরে ছাপাখানা বসল। ছাপার কাজ শুরু হ'ল ১৩২৭ সালের ২৭শে পৌষ থেকে। হরিদাস নকীপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন ১৩৩৬ সালের ৯ই বৈশাখ। এই ক' বছরের মধ্যে নকীপুরের প্রেসে কখন কি বই ছাপা হয়েছে সে সব কথা হরিদাস তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে ও 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তে' লিখে রেখে গেছেন। তা থেকে আমরা একটী তালিকা তৈরী করে নীচে দিয়ে দিলাম।—

(ক) উত্তররামচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩২৭ সালের ২৭শে পৌষ থেকে ১৩২৮ সালের ২৫শে ভাদ্র।

(খ) স্মৃতিচিন্তামণির দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩২৭ সালের ১৩ই চৈত্র থেকে ১৩২৮ সালের ১৩ই ফাল্গুন।

(গ) কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের প্রথম সংস্করণ (মহাকাব্য সপ্তম সর্গান্ত—মল্লীনাথকৃত টীকা ; হরিদাসকৃত অন্বয়, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ এবং কাশীর কোন পণ্ডিতকৃত হিন্দী অনুবাদসহ) —১৩২৭ সালের ১৮ই চৈত্র থেকে ১৩২৮ সালের ১০ই কার্ত্তিক ।

(ঘ) শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের প্রথম সংস্করণ (প্রকরণ—হরিদাসকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) —১৩২৮ সালের ২৯শে ভাদ্র থেকে ১৩২৯ সালের ২৭শে আষাঢ় ।

(ঙ) কালিদাসকৃত মালবিকাগ্নিমিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩২৮ সালের ১৭ই ফাল্গুন থেকে ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন ।

(চ) কালিদাসকৃত রঘুবংশের প্রথম সংস্করণ (মহাকাব্য ; মল্লিনাথকৃত টীকা ; হরিদাসকৃত অন্বয়, বাচ্যান্তর, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ এবং কাশীর কোন পণ্ডিতকৃত হিন্দী অনুবাদসহ ।)-- ১৩২৯ সালের ২রা শ্রাবণ থেকে ১৩৩০ সালের ২১শে চৈত্র ।

(ছ) কালিদাসকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম সংস্করণ (নাটক , হরিদাস রচিত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)—১৩২৯ সালের ৫ই কার্ত্তিক থেকে ১৩৩০ সালের ১৫ই কার্ত্তিক ।

(জ) বাণভট্টকৃত কাদম্বরীর দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩০ সালের ১১ই পৌষ থেকে ১৩৩২ সালের ২৬শে শ্রাবণ ।

(ঝ) মাঘকৃত শিশুপালবধের প্রথম সংস্করণ— মহাকাব্য ; মল্লিনাথকৃত টীকা ; হরিদাসকৃত অন্বয়, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ এবং কাশীর কোন পণ্ডিতকৃত হিন্দী অনুবাদসহ ।)— ১৩৩১ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩৩২ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ ।

(ঞ) শ্রীহর্ষকৃত নৈষধচরিত । মহাকাব্য – পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ ; হরিদাসকৃত জয়ন্তীনামক টীকা, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ ।)—১৩৩১ সালের ৮ই শ্রাবণ থেকে ১৩৩৪ সালের ১৪ই বৈশাখ এবং ১৩৩৪ সালের ২১শে শ্রাবণ থেকে ১৩৩৪ সালের ৫ই ফাল্গুন ।

(ট) স্মৃতিচিন্তামণির তৃতীয় সংস্করণ—১৩৩৪ সালের ২৫শে পৌষ থেকে ১৩৩৫ সালের ২৩শে ভাদ্র ।

(ঠ) সাহিত্যদর্পণের দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩৪ সালের ২৭শে পৌষ থেকে ১৩৩৫ সালের ১৬ই মাঘ ।

(ড) বিশাখদত্তকৃত মুদ্রারাক্ষস (নাটক ; হরিদাসকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)

তাঁর টীকা, টিপ্পনী, বঙ্গানুবাদ ও ব্যবস্থাগ্রন্থটি তখনই ছাত্র ও পণ্ডিতমহলে সমানভাবেই আদৃত হয়েছিল। তা না হলে গ্রন্থগুলির এতগুলি সংস্করণ বার করবার দরকার হত না। বিশেষ করে সাহিত্যদর্পণে'র এমন সরল প্রাঞ্জল টীকা যে আর বেশী নেই, এ কথা সকলেই জানেন। একটি প্রশ্ন কিন্তু এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে— এতগুলি গ্রন্থের টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ করার পেছনে কি তাঁর কোনো পরিকল্পনা ছিল ? সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাভারতের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করার পরিকল্পনা কি তখনই অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর মনে ? তাই কি তিনি প্রস্তুতি হিসেবে নকীপুরে কাব্য, প্রকরণ, নাটক, গদ্যকাব্য, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থের সঙ্কলন, টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন ? মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ বের করতে হলে হাতে অন্ততঃ বেশ কিছু টাকা নিয়ে যে কাজে নামতে হবে এ কথা কি তিনি তখনই বুঝেছিলেন ? আর সেজন্যেই কি তিনি চাহিদার কথা খেয়াল করে অর্থ সংগ্রহের আশায় এই গুরুতর শ্রমস্বীকার করেছিলেন ? এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে একথা তর্কাতীত যে তিনি প্রথমে সঙ্কল্প স্থির করে তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সিদ্ধির পথে এগিয়ে যেতেই অভ্যস্ত। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে একথা অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে নকীপুরের জীবনকে তিনি এক সর্ব্বাত্মক প্রস্তুতিপর্ব্ব হিসেবেই ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর সৃজনীপ্রতিভা টীকা, টিপ্পনীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, থাকেও নি। আগেই বলেছি যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 'যশোর নগরধাম'-এর কোলেই নকীপুর গ্রাম। প্রতাপাদিত্যের বীরত্বগাথা সভাবতই তরুণ কবি হরিদাসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কিন্তু শুধু লোকমুখেই প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তির কথা শুনে তিনি তাঁর চরিতকথা রচনা করার সিদ্ধান্ত নেন নি। সময়মত তিনি বাংলা কয়েকখানি ইতিহাস ও নাটক প্রথমে পড়লেন। তারপর তিনি 'বঙ্গীয় প্রতাপ' নাটকটি লিখতে আরম্ভ করলেন বাংলায় নয়, সংস্কৃতে। তিনি সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জগৎবাসীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে বাঙালী দুর্ব্বল নয়, রণ-ভীরু নয়। নাটকটির রচনা তিনি শেষ করেন ১৩২৪ সালে ; কিন্তু ছাপাবার ব্যবস্থা করেন অনেক পরে। আমরা পরে তাঁর তিনটি দেশাত্মবোধের নাটকের ('বঙ্গীয়প্রতাপম্', 'মিবারপ্রতাপম্' ও 'শিবাজীচরিতম্' —মহানাটক) আলোচনা একসাথেই করব।

কবি. নাট্যকার, টীকাকার, অনুবাদক ও প্রকাশক হরিদাসের কর্ম্মব্যস্ততার আবর্ত্তে কিন্তু অধ্যাপক হরিদাস মোটেই তলিয়ে যান নি। সনিষ্ঠ অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনচর্য্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। জমিদার হরিচরণ রায়চৌধুরী 'হরিচরণ চতুষ্পাঠী'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরিদাস। বছরে বছরে বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সে সব শিক্ষার্থীদের নামধামও হরিদাস তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের হক্‌দার বোধহয় ছিলেন হরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণ-কাব্য-স্মৃতিতীর্থ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, রাধাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্যামাকান্ত স্মৃতিতীর্থ এবং জিতেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। অধ্যাপনার সঙ্গে যজন-যাজন ও দীক্ষাদানও করেছেন তিনি। ফলে তাঁকে কেন্দ্র করে নকীপুরে শিক্ষার্থী, জিজ্ঞাসু ও যজমানদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার খ্যাতি তখনই বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পণ্ডিত-প্রধান কাশীধাম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সেখানকার ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁকে ১৩২২ সালে 'মহোপদেশক' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ব্যাপারেও একটু সন তারিখের হেরফের আছে। 'সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তে'র বিবরণ অনুযায়ী হরিদাস 'মহোপদেশক' উপাধি লাভ করেন ১৩২৩ সালে। 'ঘটনাপঞ্জী'তে তিনি বলেছেন যে ১৩২২ সালে ২৯শে মাঘ তাঁর এই উপাধির সনদ আসে। আমরা 'ঘটনাপঞ্জী'তে লেখা সালটাকে (১৩২২) মেনে নেওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করি, কেননা সেখানে সনদের তারিখটি পর্য্যন্ত বসানো আছে।

নকীপুরে থাকা কালীন হরিদাসের সংসারে অনেক নতুন অতিথি এসেছে; আবার মহাগুরু নিপাতও ঘটেছে এবং অকালে একজন বিদায় নিয়েছে। ১৩১৬ সালের ১০ই ভাদ্র তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তৃতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্রের জন্মের তারিখ হ'ল, ২৪শে পৌষ ১৩১৯ সাল (বুধবার)। তারপর পাঁচটী কন্যা এসেছে তাঁর সংসারে। তাদের জন্মের তারিখ হল—মঙ্গলবার, ২১শে পৌষ, ১৩২১ সাল; বৃহস্পতিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল; শুক্রবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল; শুক্রবার, ১৪ই পৌষ, ১৩২৯ সাল এবং সোমবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। এবং তাদের নাম হ'ল ইন্দিরা, লীলাবতী, ভবানী, বিভা ও দুর্গা। চতুর্থ পুত্র ভবেশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করে বুধবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ,

১৩৩৫। ইতিমধ্যে ১৩২৯ সালের ২৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার শশিশেখরের প্রথম পুত্রের (হরিদাসের প্রথম পৌত্র) জন্ম হয়। তারও আগে ১৩২৮ সালের ২১শে মাঘ রাত দেড়টার সময় হরিদাসের পিতৃদেব পরলোক গমন করেন। হরিদাস নকীপুরে টেলিগ্রাফ-যোগে এই শোক-সংবাদ পেয়ে সপরিবারে উনশিয়ায় চলে যান। সেখানে ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লোকান্তরিত পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, অধ্যাপক-বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন ও অন্যান্য শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত আচার ও অনুষ্ঠান পালন করেন। ঘটনাপঞ্জী থেকে জানা যায় যে এই সব কাজে তাঁর মোট খরচ হয় এক হাজার টাকা। তখনকার দিনের এক হাজার টাকা কম টাকা নয়। হরিদাস পিতৃশ্রাদ্ধে মুক্ত হস্তেই খরচা করেছিলেন। ১৩৩৩ সালের ২৭শে বৈশাখ তাঁর পুত্র শশিশেখরের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। আবার ১৩৩৩ সালেরই ৭ই অগ্রহায়ণ শশিশেখরের প্রথম পুত্র অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এতে হরিদাস ঠিক কতটা শোকতাপ পেয়েছিলেন তা তাঁর ঘটনাপঞ্জী পড়ে বিশেষ বোঝা যায় না। সেখানে তিনি শুধু বলেছেন যে—"১৩১৩ সালের ৭ অগ্রহায়ণ আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্র আদরের কানু পরলোক গমন করে।" ১৩৩৪ সালের ৪ঠা আষাঢ়—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা "শ্রীমতীইন্দিরার হরিণাহাটীতে শ্রীযুক্ততারাচরণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমানকালিকাপ্রসাদের সঙ্গে" বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্যয় হয় মোট এগার শত টাকা। সেকালের হিসেবে হরিদাস রীতিমত ঘটা করেই প্রথম মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে ১৩৩০ সালের ৪ঠা মাঘ শ্রীমান হেমচন্দ্রের উপনয়নেও তিনি খরচ করতে কসুর করেন নি।

কিন্তু সব সুযোগ, সুবিধা ও স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও হরিদাসের নকীপুরে আর বেশী দিন থাকা সম্ভব হ'ল না। গ্রাম্য-বিবাদ ও দলাদলির জন্যে প্রায় বাইশ বছর আগে তিনি নিজের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। নকীপুরেও সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। শান্তিপ্রিয় হরিদাস অশান্তির চাপে হাঁপিয়ে উঠলেন। এ দলাদলির সঞ্চার ও বিস্তারের ইতিহাস ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে। এখানে সে-সব কথা আলোচনা করার বিশেষ দরকার দেখি না। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলে রাখি যে রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর দুই ছেলের (সতীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ) মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়ে যায়। হরিদাসের মধ্যস্থতায় প্রথম প্রথম অবশ্য সুফল ফলে। তাতে দুই কর্ত্তাই এবং গ্রামবাসীরা খুসীই হয়েছিলেন। কর্ত্তারা ত হরিদাসকে 'দরেগাতি হিসাবে বিনা

সেলামিতে এবং অল্প খাজনায় ৩৬ বিঘা ১৩ কাঠা জমি দান করেন ও কায়েমী পাট্টা দেন এবং পূর্ব্বদত্ত ১৮ বিঘা জমির দানপত্রও লিখিয়া দেন।' কিন্তু এ-সবই সাময়িক মাত্র। দুই কর্ত্তা ছিলেন দুই মেরুর অধিবাসী; দুজনের মধ্যে ধ্যানধারণার ব্যবধানও ছিল প্রায় অ-সেতুসম্ভব। তাই কিছুতেই কিছু হ'ল না। ক্রমে ব্রাহ্মণ ও গ্রামবাসীদের মধ্যেও দলাদলির বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামে আর শান্তি বলে কিছু থাকে না। এই গোলমালের সময় চতুষ্পাঠীটিও অবহেলার কবলে পড়ে। ভূয়োদর্শী হরিদাস বুঝলেন যে নকীপুর ছাড়ার দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। তিনি স্থির করলেন যে আর গ্রামে গ্রামে ঘোরা নয়; এবারে মহানগরী কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। কলকাতার পণ্ডিত-সমাজেও তিনি তখন অপরিচিত ছিলেন না। তিনি আর দেরী না করে কলকাতায় চলে আসার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিলেন। ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাসের প্রথম দিকে তিনি একটী সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় এলেন। সেই সুযোগে তিনি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর (২০ নং সুরি লেন, কলকাতা) সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মনের কথা খুলে বললেন। দেবপ্রসাদ সব শুনে খুশী মনে হরিদাসের থাকার ব্যবস্থা করলেন—৪১ নং সুরি লেনের একটি বাড়ীতে। বাড়ী ভাড়া ধার্য্য হ'ল মাসিক ৬৩ টাকা এবং স্থির হ'ল বৈশাখ মাস নাগাদ সেখানে সপরিবারে এসে উঠবেন। দেবপ্রসাদের সঙ্গে হরিদাসের আলাপ-পরিচয় আগে থেকেই ছিল। ঘটনাচক্রে এবার তাঁদের মধ্যে সার্থক সখ্যতার সূচনা হ'ল। হরিদাস শেষবারের মত ফিরে গেলেন নকীপুর। গরমের ছুটিতে ছাত্ররা তখন যে যার বাড়ী চলে গেছে। বাসন্তী পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল এবং এসে গেল নতুন বছর, ১৩৩৬ সাল। নতুন বছরে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হরিদাস কলকাতায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ছাত্রেরা তখন অনুপস্থিত, কিন্তু শিষ্য যজমানেরা ত আছেন। তাঁদের বিনা সম্মতিতে তিনি নকীপুর ছেড়ে যাবেন কি করে? তাঁরা অবশ্য সব শুনে ম্লান মুখে মত দিলেন। শেষে, ১৩৩৬ সালের ৮ই বৈশাখ যাবতীয় বই ও পুঁথি, প্রেস ও তার তামাম সরঞ্জাম, গৃহস্থালীর জিনিষপত্তর ইত্যাদি একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ও মাঝিমাল্লাদের জিম্মায় জলপথে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। আর ৯ই বৈশাখ সপরিবারে হরিদাস স্থলপথে কলকাতার দিকে শুভযাত্রা করলেন। পিছনে পড়ে রইল নকীপুরের টোলবাড়ী, তাঁর দীর্ঘদিনের অনুশীলনভবন আর সামনে তাঁর পরিণত বয়সের সাধনা, সিদ্ধি ও স্বীকৃতির অমরাবতী—কলকাতা।

॥ পাঁচ ॥

১৩৩৬ সনের ১০ই বৈশাখ হরিদাস কলকাতায় এসে ৪১নং সূরী লেনের বাসায় উঠলেন। এবার শুরু হ'ল তাঁর জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় —চতুর্থ অধ্যায়। হরিদাসের বয়স তখন বাহান্ন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চির-চেনা পল্লীর কোল ছেড়ে শহরে এসে আশ্চর্য্য দ্রুততার সঙ্গে কলকাতাকে চিনে নিলেন এবং তার নাড়ীর খবর পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে এই রাজধানী বিলাস-ব্যসনের বিচিত্র আয়োজনের সঙ্গে বড় কাজের জন্যেও শত সুযোগ-সুবিধার সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে। তাই একটা বড় কাজের পরিকল্পনা তাঁর মনে আনাগোনা করতে লাগল। ক্রমে তাঁর সর্ব্ব-শাস্ত্রসপুষ্ট মনে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাভারত প্রকাশ করার বাসনাই আভাসিত হ'ল। মাত্র দু'তিন দিন গভীর, অথচ দ্রুত চিন্তা করেই তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও সাহসিকতার বলেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। কলকাতার পণ্ডিত-সমাজে অবশ্য তখনই তিনি সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা অনিশ্চিত। 'সিদ্ধান্তবিদ্যালয়' নামে একটী টোল তাঁর বাড়ীতে বসেছে। কিন্তু বিদ্যার বেসাতি করার কথা কোনো-দিন তাঁর মনেও আসে নি। তাঁর 'ব্রহ্মোত্তর' ও 'দরগাঁতি'র জমি ত স্মৃতিভারেই পড়ে রইল নকীপুরে। এদিকে তাঁর বেশ বড় মাপেরই সংসার। উনশিয়ার সংসারের ভারও তাঁরই ঘাড়ে। তার ওপর মাসে মাসে ৬৩ টাকা করে বাড়ী ভাড়াও গুণতে হবে। ভরসা একমাত্র বই বিক্রির টাকা কটি! ঘটনা-পঞ্জীতে তিনি নিজেই লিখেছেন "কলিকাতায় বই বিক্রীলব্ধ টাকাই মাত্র সম্বল হইল, মাসে বাড়ীভাড়া সমেত প্রায় দুইশত টাকা খরচ হইতে লাগিল।" কিন্তু হরিদাসের মন তখন দৈবী প্রেরণায় আলোকিত। তিনি এসব চিন্তাকে মোটেই আমল দিলেন না। বরং মনে মনে তিনি মহাভারতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণের একটা পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললেন। তারপর এক অনধ্যায়ের দিন সকালে তাঁর প্রতিবেশী ও পরমসুহৃৎ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। হরিদাস তাঁর পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। কথাবার্তা সেদিন বড়

একটা হ'ল না। পরের দিন তাঁরা তিনজনে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় বসলেন। মহাভারতেব এই পরিকল্পিত সংস্করণে কি কি থাকবে, কোনো ধনীর আনুকূল্যে এই গ্রন্থমালা প্রকাশিত হবে কি না, প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে, কোন কাগজের কত ফর্ম্মায় এক এক খণ্ড হবে, বাংলা না দেবনাগর অক্ষরে ছাপা হবে—ইত্যাদি সব কিছুই এ আলোচনামূলে স্থির হয়ে গেল। ছ'জন সমকালীন মনীষীর সানন্দ সমর্থন পেয়ে হরিদাস উৎফুল্ল মনে বাসায় ফিরে এলেন; এবং এক বিরাট জ্ঞান ও কর্ম্মযজ্ঞের হ'ল শুভসূচনা। সেই অলৌকিক যজ্ঞ ও তার ঋত্বিক হরিদাসের কথাই এই পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব। মহাভারতের ও মহাভারতকে আশ্রয় করে যে অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার কথা দিয়েই এ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

অমৃত সমান মহাভারতের মহিমার কথা মহাভারতেই আমরা পাই। স্বর্গারোহণপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে পুরাণকথক, সৌতির মুখে স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন—

“ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ!।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥৪৯॥”

“ভরত শ্রেষ্ঠ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিবিষয়ে এই মহাভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যস্থানেও আছে, যাহা ইহাতে নাই, তাহা কোথাও নাই ॥৪৯॥”*

এ যুগের রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে মহাভারত পৃথিবীর মানদণ্ড। তিনি লিখেছেন— “…আমার অল্পবয়স হইতেই মহাভারত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের হিমালয়ের মত যেমন উত্তুঙ্গ তেমনি সুদূর প্রসারিত,

‘পূর্ব্বাপরৌ তোয় নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥’

পৃথিবীর মানদণ্ডই বটে। এই একখানি গ্রন্থ নানা দিক দিয়া বিরাট মানবচরিত্রের পরিমাণ করিয়াছে। একাধারে এমন বিপুল বিচিত্র-সাহিত্য আর কোনো ভাষায় নাই। অন্যদেশের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, মহাভারত না পড়িলে আমাদের দেশের কাহারোও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।…”† বিদেশী রসপণ্ডিতদেরও অভিভূত করেছে মহাভারতের ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও বস্তুগৌরব। জার্ম্মান পণ্ডিত জন জ্যেকব মেয়ার

বলেছেন—“[মহাভারত] এক ভারতবর্ষীয় অরণ্যের মতো বিস্তীর্ণ; তাতে বৃক্ষসমূহ পরস্পরে বিজড়িত ও স্থূলাঙ্গ লতাগুল্মে জটিল; বহুবিচিত্র পুষ্পমঞ্জরীতে তা বর্ণিল ও সুগন্ধি, সর্ব্বপ্রকার জীবের তা বাসস্থান। আমরা শুনতে পাই—মনোমুগ্ধকর বিহঙ্গধ্বনি, আর সেই সঙ্গে বন্য শ্বাপদের ভীষণ হুংকার; বিষাক্ত সাপ নম্র কপোতের পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে; সেখানে বাস করে দস্যু—বিধিবিধান থেকে মুক্ত, কিন্তু অবিশ্বাস্য কুসংস্কারের দাস; আর সেই সঙ্গে থাকেন ত্যাগপরায়ণ মনস্বী, যাঁর দৃষ্টি জগৎসীমান্তের উর্ধ্বলোকে সংহৃত, এবং যাঁর ভাবনা বহির্বিশ্বের ও তাঁর নিজের অন্তরাত্মার গভীরতম স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। অন্য যে-কোনো ক্ষমতাকে যা ইচ্ছাশক্তিতে অতিক্রম ক'রে যায়, এমনি এক অফুরান প্রাণের ঐশ্বর্য্য এখানে বদ্ধমূল; আর তারই পাশে পাওয়া যায় বহু-সহস্রাব্দ-সঞ্চিত এক গুরুভার ও নিষ্প্রাণ নিদ্রা. স্বপ্নের সেই অতি গভীর তলদেশ, যার মধ্যে আমরাও হয়তো মগ্ন হয়ে যেতাম, যদি না দংশনকারী অসংখ্য মক্ষিকাও থাকতো। আর এমনি করে দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারতাম আমরা, বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুধাবন করে, কিন্তু যাত্রা শেষে কখনোই উত্তীর্ণ হতাম কিনা সন্দেহ।”*

আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—“মহাভারত জগতের চার-পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম, এবং বিচার করিয়া দেখিলে, নানা দিক দিয়া মহাভারতের স্থান অদ্বিতীয়।...মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের ভারত পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট হইতে লব্ধ এই রিক্থের মহনীয়তা এবং জাতীয় জীবনে ইহার অপরিমেয় মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে, তাই মহাভারতের (এবং রামায়ণ ও পুরাণের) অনুবাদকে আশ্রয় করিয়া আমাদের ভাষা সাহিত্যের পত্তন বা বিকাশ; তাই আধুনিক কালে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আলোচনা আমরা ছাড়ি নাই।...”†

এদেশে মহাভারতের প্রকাশনা ও প্রচার প্রচেষ্টার শুভ সূত্রপাত হয় Committee of Public Instruction-এর প্রযত্নে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মূল মহাভারতের প্রথম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন হয় দেবনাগর অক্ষরে। তারপর এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বিরাট গ্রন্থমালার সম্পাদনা করেছিলেন নিমাই শিরোমণি, নন্দগোপাল

পণ্ডিত, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামগোবিন্দ পণ্ডিত ও রামহরি ন্যায়পঞ্চানন। তাঁহাদের আদর্শ গ্রন্থ ছিল সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশালার পুঁথিগুলি। মহাভারতের এটিই আদি প্রামাণিক সংস্করণ এবং সম্পাদনার প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে নিমাই শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিতেরা আমাদের স্মরণীয়। কিন্তু চারখণ্ডে প্রকাশিত এই সংস্করণের দাম তখনই ছিল ৮০ টাকা। কাজেই এই গ্রন্থমালা যাঁদের জন্যে ছাপা হ'ল, অর্থাৎ সংস্কৃত পণ্ডিতদের, তাঁদের নাগালের বাইরেই থেকে গেল। তখন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতবচাঁদ বাহাদুর পণ্ডিতদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। ১২৬৯ থেকে ১২৮৮ সনের মধ্যে মূল মহাভারত বাংলা হরফে ছেপে পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করেন। বাংলা হরফে এই প্রথম মূল মহাভারতের মুদ্রাঙ্কন। দর্শনাচার্য্য নীলকণ্ঠের প্রসিদ্ধ টীকাটি বাংলায় প্রথম মুদ্রাঙ্কিত করার গৌরব বোধহয় শ্রীরামপুরের হরিশচন্দ্র দেবচৌধুরী এবং সত্যব্রত সামশ্রমি মশায়ের। ১২৭৮ সন থেকে সামশ্রমি মশায়ের সম্পাদনায় ও দেবচৌধুরী মশায়ের ব্যয়ে বাংলা হরফে নীলকণ্ঠের টীকাসহ মহাভারত প্রকাশিত হতে থাকে। তারপর আবার কালীবর বেদান্তবাগীশ মশায়ের সম্পাদনায় নাগরী অক্ষরে মূল মহাভারত মুদ্রিত করেন কেদারনাথ রায়। এর কিছু পরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংস্করণ হ'ল 'বঙ্গবাসী'র বাংলা অক্ষরে ছাপা নীলকণ্ঠের টীকাসহ মূল মহাভারত। পণ্ডিতেরা উপকৃত হলেন—বাংলা হরফে ছাপা সটীক মূলের মাধ্যমে তাঁরা মহাভারতের কথামৃতের আস্বাদ পেলেন। কিন্তু জনসাধারণের জন্যে তখন ছিল কেবল কাশীদাসী মহাভারত। "১৮০২ খৃষ্টাব্দেই কেরী কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা শুরু হয় আগে, ইহা চারিখণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল।"[†] ধন্য কাশীরাম দাস, ধন্য কেরী! কাশীরাম দাসের মহাভারত যে মূলের সঙ্গে সর্ব্বাংশে মেলে না এবং তাতে যে অনেক নতুন উপাখ্যান জনচিত্তরঞ্জনের জন্যে অবতারণা করা হয়েছে—এ-সব কথা আজ সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও জনসাধারণ কাশীরামের কল্যাণেই 'অমৃতসমান' মহাভারতকথার পুরোপুরি স্বাদ না পেলেও অন্তত সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই মহাভারত শিক্ষিত অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে নি। তাই প্রয়োজন হ'ল মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদের। এই অনুবাদপর্বের স্মরণীয় পথিকৃতদের পুরোভাগে আছেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিই প্রথম মহাভারতের অনুবাদ করতে

[†] 'উইলিয়ম কেরী' শ্রীসজনীকান্ত দাস (পৃঃ ৪১)

আরম্ভ করেন এবং সে অনুবাদের কিছুটা অংশ প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু খ্যাতকীর্ত্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের উদ্যোগের কথা শুনে, তিনি আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হন নি। অবসর সময়ে তিনি অবশ্য কালীপ্রসন্নকে সাহায্য করতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন সাতজন পণ্ডিতের সহায়তায় ১৭৮৮ শকে (১২৭৩ সনে) তাঁর ‘কঠোর ব্রতের’ উদ্‌যাপন করেন। উপসংহারে তিনি নিজেই লিখেছেন— “১৭৮০ শকে (১২৬৫ সনে) সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশপর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।…” এই মহাভারতই কালীসিংহীর মহাভারত নামে বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। বর্দ্ধমান রাজবাড়ী থেকে পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্পাদনায় মহাভারতের তাঁর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—তাতে ছিল মূল ও বাংলা অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন ও বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে বিতরণ করা হয়েছিল। ফলে প্রথম দিকে মহাভারতের এই দুটি সংস্করণ জনসাধারণের উপকারে আসে নি। তাই ১২৭৬ সনে গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠের টীকা ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মশায়ের বাংলা অনুবাদসহ মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু আর বেশীদূর তিনি এগোতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তারপর হরিশ্চন্দ্র দেবচৌধুরীর ব্যয়ে ও কালীবর বেদান্তবাগীশ মশায়ের সম্পাদনায় আবার সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ ও ভীষ্মপর্ব্বের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গদ্যের মত পদ্যেও মহাভারতের অনুবাদে কয়েকজন ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ই সমগ্র মহাভারতের পদ্যানুবাদ করে যেতে পেরেছেন। ইংরেজীতে মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেন প্রতাপচন্দ্র রায় (১৮৮৪—৯৬ খৃষ্টাব্দ) ও মন্মথনাথ দত্ত (১৮৯৫—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)। এবার বিশ্ববাসীও মহাভারতের আনন্দযজ্ঞে অংশভাক হলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদক হিসেবে প্রতাপচন্দ্রের ও মন্মথনাথেরই নাম আছে। পুণার ভাণ্ডারকর অনুসন্ধান সমিতি দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়, বহু পণ্ডিতের সহায়তায় এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় এক প্রামাণিক ও ‘পাঠান্তরময় গবেষণাত্মক’ সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন। উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে— “…পরিকল্পনায় প্রবর্ত্তকদের উদ্দেশ্য, সংক্ষেপে, হ’ল

এই : অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটীর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ও প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্রাদির তুলনামূলক বিচার, মূল্যায়ন ও সমন্বয়সাধন করে মহাভারতের একটি প্রামাণিক সংস্করণের প্রকাশনা…।"* এই সংস্করণের স্বর্গারোহণপর্ব্বটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে।

এদিকে 'বঙ্গবাসী'র মহাভারতের সংস্করণ ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে গেল; অন্যান্য সংস্করণগুলিও হয় দুষ্প্রাপ্য না হয় অপ্রাপ্য। ঠিক এই সময়ই যেন এক পুণ্যপ্রেরণার বলে হরিদাস একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাভারত প্রকাশের শুভসঙ্কল্প করলেন। আমরা দেখেছি যে এর আগে সাধারণতঃ মহাভরতের ভাষান্তর ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে পণ্ডিতবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং ধনীব্যক্তিদের উদার উদ্‌যোগে অথবা বিভিন্ন সংস্থার বা সমিতির বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনায়। হরিদাস কিন্তু মহাভারত প্রকাশনার ক্ষেত্রে যা করলেন তার কোনো নজির নেই—দরিদ্র পণ্ডিতের একক প্রচেষ্টা। আর তাঁর 'মহাভারতম্'-এর পরিকল্পনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সকলশ্রেণীর পাঠকের প্রতি আমন্ত্রণ। তাঁর সংস্করণে মূল আছে; পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত নীলকণ্ঠের 'ভারতভাবদীপ' টীকাটি আছে; সংস্কৃতরসিকদের জন্যে আছে তাঁর নিজস্ব সহজ প্রাঞ্জল টীকা 'ভারতকৌমুদী' এবং সর্ব্বসাধারণের জন্যে আছে মূলানুসারী বাংলা অনুবাদ। হরিদাসের পূর্ব্বসূরী নীলকণ্ঠের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। হরিদাস তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—"দর্শনাচার্য্য নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি গোদাবরী নদীর তীরে পুণা বা পুণ্য-পত্তন অঞ্চলে কূর্পর গ্রামের (কোপার গাঁও) গৌতম গোত্রীয় চতুর্দ্ধরবংশ-সম্ভূত। এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গোবিন্দ পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল ফুল্লাম্বিকা। নীলকণ্ঠ তাঁহার 'ভারতভাবদীপ' টীকায় নারায়ণতীর্থ, ধীরেশ মিশ্র, লক্ষ্মণ, গোপল, গঙ্গাধর, নীলকণ্ঠ ও সাম্বশিবের নাম নিজের গুরুদেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হমীর পুরীতে অবস্থান করিয়া মহাভারতের টীকা রচনা করেন। নীলকণ্ঠ তাঁহার 'ভারতভাবদীপ' টীকায় ভীষ্মপর্ব্বের ২৬ অধ্যায়ে (২৭৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন —'অস্যাধ্যায়াস্যার্থঃ সংগৃহীতো মধুসূদন শ্রীপাদৈঃ'। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, নীলকণ্ঠ আমাদের মধুসূদন সরস্বতীর পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত অন্যকিছু নীলকণ্ঠ

---

* আদিপর্ব্বের ভূমিকা—পৃঃ iii—iv (মূল ইংরেজী পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।)

সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে. বলা যায় না।"* নীলকণ্ঠের টীকাটি পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হলেও আমাদের পক্ষে দুরূহ।. তাঁর ব্যাখ্যাও সাধারণতঃ খুবই সংক্ষিপ্ত। বেশীর ভাগ শ্লোকের তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যাই করেছেন এবং অনেক শ্লোক তিনি একেবারেই ধরেন নি। তাই একান্ত প্রয়োজন ছিল 'ভারতকৌমুদী'র মত একটি টীকার যার সাহায্যে সংস্কৃতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পাঠকও মূলের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। হরিদাস নিজেই লিখেছেন—

"খর্ব্বাকারা বিষমকঠিনা ভাবহীনাবসন্না
ন প্রাচীনা মদয়তি মনো মানবানাং নবানাম্।
যোগ্যাকারা সুষমসরলা ভাবরম্যা প্রসন্না
নব্যা ত্বেষা ননু জনয়িতা প্রীতিমেষামশেষাম্॥" †

মহাভারত সম্পাদনার কাজে প্রথম সমস্যা হ'ল—অষ্টাদশ পর্ব্বের সম্পূর্ণ শ্লোক সংখ্যা নির্ণয়, পর্ব্ব ও পর্ব্বাধ্যায় বিন্যাস, এবং পর্ব্ব ও পর্ব্বাধ্যায়গুলির প্রতিটির শ্লোকাঙ্ক স্থির করা। হরিদাস আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের (পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়) সাহায্যেই এই সমস্যাগুলির সমাধান করলেন। সেখানে কোন পর্ব্বে কত অধ্যায়, কত শ্লোক এবং কোন উপাখ্যান বা বৃত্তান্তের পরে কোন বৃত্তান্ত—এ-সব তথ্য পরিষ্কার করেই লেখা আছে। আবার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষেই 'শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং' কথাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমগ্র মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। সুতরাং তিনি গবেষণা ও গণনা করে বৃত্তান্ত, অধ্যায় ও শ্লোকগুলি এমনভাবে সাজালেন যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের বিবরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে এবং সমগ্র মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ। তাঁর 'মহাভারতম্'-এর প্রতি-পর্ব্বের প্রথমেই আছে 'নিবেদন'; অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটি তালিকা ও পাঠক্রমে একটী বৃহৎ সূচীপত্র। স্বর্গারোহণপর্ব্বে আমরা পাই সমগ্র মহাভারতের উপপর্ব্ব, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটি সঙ্কলন। সেই সঙ্কলনে যে সব পর্ব্বের উপপর্ব্ব নেই, সেখানে মূল পর্ব্বকেই হরিদাস উপপর্ব্ব বলে ধরেছেন। তাঁর মতে তাই মহাভারতের (হরিবংশসহ) উপপর্ব্বসংখ্যা ১০০, অধ্যায়সংখ্যা ২৯৬০ এবং শ্লোকসংখ্যা ১,০০০,০০। প্রমাণস্বরূপ তিনি আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোক উপস্থাপিত করেছেন—

"ভবিষ্যং পর্ব্ব চাপ্যুক্তং খিলেষ্ববাদ্ভুতং মহৎ।
এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা ॥৮৫॥"

এ গণনা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ নির্ণয়ও তিনি করেছেন। যে পাঠ, যেখানে গ্রহণ করলে অর্থসঙ্গতি ও বস্তুগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ ঋষিপরিগণিত শ্লোকসংখ্যার সঙ্গেও গরমিল হয় না, তাই তিনি করেছেন; পাঠান্তর নির্দ্দেশিত করেছেন পাদটীকায়। তাঁর পিতামহের হাতে লেখা পুঁথিটিই তিনি প্রধান আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া দাক্ষিণাত্য কুম্ভঘোণ ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণগুলিও আদর্শ পুস্তক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির ও বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারতও তিনি সংগ্রহ করেন। আদিপর্ব্বের 'নিবেদন'-এ তিনি এই সংস্করণ-গুলির নাম করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি আরও কয়েকটি সংস্করণের সাহায্য নিয়েছেন। বিরাটপর্ব্বের 'নিবেদন'-এ তিনি লিখেছেন—"...এই পর্ব্বের নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিবার সময়ে আমি বিভিন্নদেশীয় সাতখানি পুস্তক আদর্শ লইয়াছিলাম; তাহার মধ্যে আমার প্রপিতামহ মহাপণ্ডিত ৺রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্তমহাশয় আজ হইতে ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে যে বিরাটপর্ব্ব স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে পুস্তক আমার পিতামহ ৺কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও পিতৃদেব ৺গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি অসাধারণ পণ্ডিতগণ বহুবার পাঠ ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পুস্তকই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। পণ্ডিত ৺মহাদেব শর্ম্মা নানাদেশীয় অতি প্রাচীন পুস্তকসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া 'গুজরাতী মুদ্রণালয়ে' যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন এবং পুণা ভাণ্ডারকর সমিতি নানাদেশীয় বহু পুস্তকদৃষ্টে বহু গবেষণা করিয়া যে পুস্তক বাহির করিয়াছেন, সেই দুইখানি পুস্তকের সহিত আমার প্রপিতামহ লিখিত পুস্তকের প্রায়ই বিশেষ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছি, এবং এই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, কল্পিত পাঠান্তরগুলি অনতি-প্রাচীনকালে বিরাটপর্ব্বের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।..." 'নিবেদন'-এর শেষে আদর্শ-পুস্তকগুলির একটী তালিকাও দিয়ে দিয়েছেন—

"—(আমার) প্রপিতামহ লিখিত পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় পুস্তক।
—বাপুদেবশাস্ত্রি-সংশোধিত কাশীদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক।
—বঙ্গবাসী-সংবাদপত্র-কার্য্যালয়-মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক।
—রামশাস্ত্রি-সংশোধিত দাক্ষিণাত্য মুদ্রিত পুস্তক।

—মহাদেবশর্ম্ম-সংস্কৃত গুজরাতী মুদ্রণালয়-মুদ্রিত পুস্তক।

—ভাণ্ডারকর সমিতি মুদ্রিত পুণ্যপত্তন (পুণা) প্রদেশীয় পুস্তক।

কুম্ভঘোণ হইতে প্রকাশিত পুস্তক ও স্থানবিশেষে আদর্শ করা হইয়াছে।”

আদর্শ পুস্তকগুলির প্রায়ই একটার অপরটার সঙ্গে মিল নেই; পর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে কোনো সংস্করণে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দুইই বেশী, আবার কোনোটিতে অধ্যায় বেশী শ্লোক কম এবং অধ্যায়ের গরমিল ত লেগেই আছে। হরিদাস মাত্র দু'মাসের মধ্যে (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়) প্রতিপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা গণনা করে পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন—প্রস্তুতিপর্ব্ব শেষ হ'ল।

শুভদিন দেখে ১৩৩৬ সনের ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার সকাল ৭টার সময় তিনি মহাভারতের মূল লেখা, নূতন টীকা ও বাংলা অনুবাদ রচনা সুরু করলেন। ৩রা শ্রাবণ সারস্বত সাধনার, বিশেষ করে মহাভারত সম্পাদনার, ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন থেকেই হরিদাসের মন্ত্রসিদ্ধ লেখনীমুখে সৃষ্টি হতে লাগল মহাভারতের অপরূপ ব্যাখ্যা ও সরল বাংলা অনুবাদ। এতদিনে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে মহাভারতের স্বপ্নলোকের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ঐ সালের ১৪ই কার্ত্তিক থেকে বাড়ীর প্রেসে 'কম্পোজ' করে 'আবদুল লতিফের' প্রেসে ছাপার কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। ১৩৩৬ সনেরই পৌষমাসের প্রথম দিনে আদিপর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল—ওপরে বাংলা বড় বড় হরফে মূল, নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে প্রথমে 'ভারতকৌমুদী' পরে নীলকণ্ঠের 'ভারতভাবদীপ' টীকা এবং সব নীচে একটু বড় হরফে বাংলা অনুবাদ। প্রশংসার গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল। ১৩৩৮ সনের মধ্যে বিশাল আদিপর্ব্বের টীকা ও বাংলা অনুবাদ লেখাও শেষ। ঘটনাপঞ্জীতে হরিদাস লিখেছেন—“১৩৩৮ সালের ৫ঠা আষাঢ় মহাভারতের আদিপর্ব্বের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা সমাপ্ত হইল এবং ১৩৩৮ সালের ২৬শে আষাঢ় আদিপর্ব্ব ছাপা সমাপ্ত এবং ১৩৩৮ সালের ৯ই শ্রাবণ আদিপর্ব্বের মুখবন্ধ ছাপা সমাপ্ত হইল।” অনলস হরিদাস আষাঢ় মাসেই সভাপর্ব্ব ধরলেন এবং ২১শে পৌষের মধ্যে রচনা ও ছাপা শেষ হয়ে গেল। প্রশংসার গুঞ্জন তখন প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববন্দিত কবি ও বরেণ্য মনীষীরা সেদিন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে 'মহাভারতম্'কে স্বাগত জানিয়েছিলেন আর অভিনন্দিত করেছিলেন হরিদাসকে। তাঁদের প্রশস্তি-গাথার অংশবিশেষ উদ্ধার করে দিলাম—

“শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নীলকণ্ঠকৃত ও নিজকৃত টীকা ও

বঙ্গীয় অনুবাদসমেত মহাভারত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার সতেরো খণ্ড আমার হাতে আসিয়াছে। আদিপর্ব্ব শেষ করিয়া সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইল। এই সংস্করণটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে।

এমন করিয়া মহাভারত প্রকাশ করিতে যে সাহস, সতর্কতা, পাণ্ডিত্য ও দৃঢ়নিষ্ঠার প্রয়োজন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তাহা সম্পূর্ণই আছে।

একথা বলিতে পারি, পণ্ডিতমহাশয়ের এই অধ্যবসায়ে আমি নিজে তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।...”[১]

১৫ই আশ্বিন ১৩৩৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

“...এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অসীম অনুরাগ এবং শাস্ত্রে নিজ প্রগাঢ় জ্ঞানমাত্রকে সম্বল করিয়া মহাভারত-সম্পাদনের মত বিশাল ও গুরুভার কার্য্য একক আরম্ভ করিয়াছেন।...সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নীলকণ্ঠের টীকা দিতেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটি নূতন টীকাও দিতেছেন। এই টীকাটি আমাদের অতি সুন্দর লাগিয়াছে, ইহাতে কঠিন স্থল বুঝাইবার চেষ্টা আছে, আর ইহার ভাষাটি অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে ও খাঁটি সংস্কৃতের ধ্বনি ইহাতে পূর্ণভাবে মিলিতেছে। বাংলা অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে; অনুবাদ স্থানে স্থানে একটু ব্যাখ্যাত্মক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনো দোষ হয় নাই—বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বলিয়া যিনি অনুবাদ পড়িয়া বুঝিবেন, তিনি মূল দেখিয়া ভীত হইবার অবসর পাইবেন না।...দেবনাগরী অক্ষরে না হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে হওয়ায়, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মহাভারত বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে খুবই সহায়ক হইবে। কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে ছাপাইলে সমগ্র ভারত ও ইউরোপেও তাঁহার মহাভারতের প্রচার হইত;...।”[২]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

“...শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যুক্তযোগীর মত অনবরত লেখনী চালাইতেছেন, আর মূল, টীকা ও বাঙ্গালা লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়বার লিখিবার অবসর নাই বা প্রয়োজন নাই, একবার লেখাতেই প্রেসকাপি হইয়া যাইতেছে; তাহাতেই মূলের পাঠ সমীচীন, টীকাটিতে সুন্দর সরল ব্যাখ্যা ও

সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা এবং বাঙ্গানুবাদটি সরল ও মধুর হইতেছে।...”[৩]

২২শে অগ্রহায়ণ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩৩৮ সন।

“...এই সংস্করণটী সর্ব্বপ্রকারেই মনোহর হইতেছে।”[৪]

২৫শে কার্ত্তিক, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩৩৮ সন।

“...মূলের পাঠ সমীচীন, টীকাটি সরল সংস্কৃতে লিখিত অথচ তাহাতে সুবোধ্য ব্যাখ্যাসহ ধর্ম্ম ও সমাজনীতির সুসঙ্গত আলোচনা, প্রমাণস্থলে বেদ, বেদান্ত, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতির উল্লেখ এবং ‘ব্যাসকূটে’র বিশ্লেষণ আছে।...বঙ্গানুবাদটী মূলের অনুযায়ী অথচ সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।...”[৫]

হিমানী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
পোঃ কালিম্পং
দার্জ্জিলিং, ৩১।১০।৩১।

“...আমি ইহার অনেকস্থান দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অনেক মূলগ্রন্থ ও টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়া যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুশীলন-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, এই মহাভারতের সংস্করণেও তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে। বঙ্গানুবাদটি মূলের সম্পূর্ণ অনুযায়ী সরল ও সুখপাঠ্য হইতেছে।...”[৬]

২০ নং সুরি লেন, শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
কলিকাতা, ১২।১০।৩১

“...ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই টীকার বহুস্থলেই, পণ্ডিতমহাশয়ের অসাধারণ শাস্ত্রদর্শিতা, দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা, ‘ব্যাসকূট’ বিশ্লেষণে নীলকণ্ঠ অপেক্ষাও সূক্ষ্মচাতুর্য্য, ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমালোচনা, সর্ব্বোপরি ভাষার

মাধুর্য্য ও প্রাঞ্জলতা সুচারুরূপে ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গানুবাদটিও বেশ সুখপাঠ্য হইতেছে।...”[৭]

১৪/২ সার্পেণ্টাইন লেন, শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী
কলিকাতা, ২।১১।৩১

“...তাঁহার ‘ভারতকৌমুদী’ নামক মহাভারতের টীকা সরল স্থানে সংক্ষিপ্ত হইলেও, দুর্ব্বোধ্য কঠিন স্থানসমূহের অর্থপ্রকাশে বিলক্ষণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। মূলের সুসংলগ্ন পাঠ গৃহীত হইতেছে এবং অনুবাদটি যেমন সরল, তেমনই মূলানুগত হইতেছে...”[৮]

আউথ গরবি, বারাণসী, শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮ (মহামহোপাধ্যায়)

“...নীলকণ্ঠের টীকাটিও বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। তবে নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় বহু শ্লোকই ধরেন নাই; যেগুলি ধরিয়াছেন সেগুলিরও সংক্ষেপে দার্শনিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং নীলকণ্ঠের টীকা মূলের যথাশ্রুত অর্থ বুঝিবার পক্ষে তত উপযোগী নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রত্যেক শ্লোকেরই যে টীকাটি লিখিয়া যাইতেছেন, তাহা মূল বুঝিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী হইতেছে। কেন না, এই নূতন টীকাটিতে দর্শন ও স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপপত্তি এবং সমাজতত্ত্বপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।...”[৯]

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮ সন শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
১১১।৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, (মহামহোপাধ্যায়)
কলিকাতা।

“...প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দের অর্থ অতি সরলভাবে ইহাতে (‘ভারতকৌমুদী’তে) বুঝান হইয়াছে।...অথচ পণ্ডিতসমাজেরও বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয় এই টীকা-মধ্যে উপনিবদ্ধ হইয়াছে।...তাঁহার রচিত বঙ্গানুবাদ অতি সরল এবং বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে।...”[১০]

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

মহাভারতের শেষপর্ব্বে বৈশম্পায়ণের মুখে মহর্ষি বলেছেন—

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥১৬০॥"

"মানুষ সর্ব্বদাই মহাভারত শুনিবে, সর্ব্বদা বলিবে, এবং মহাভারত পুস্তক যাহার গৃহে থাকে, জয় তাহার নিজের হাতেই থাকে।"*

মহাভারতের পুণ্যপ্রভাবের মধ্যেই হরিদাস লালিত। জয় তাই যেন তাঁর হস্তগতই ছিল। 'মহাভারতম'-এর আদিপর্ব্ব প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই 'জয়' ধ্বনিত হ'ল কীর্ত্তিমান মনীষীদের কণ্ঠে।

হরিদাসের টীকার ও বাংলা অনুবাদের যে সমালোচনা তখনকার মনীষীরা করেছেন, তারপর আমাদের আর বিশেষ কিছু বলার থাকতে পারে না। শুধু একটি মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্যামূলে 'ভারতকৌমুদী' টীকার সঙ্গে আমরা অল্প একটু পরিচয় করে নিতে চাই। আদিপর্ব্বের এটি একটি বিখ্যাত শ্লোক। অনেকে এর মধ্যে সাম্প্রতিক কালের একটি প্রচলিত বিদেশী প্রবচনের আংশিক পূর্ব্বাভাসও দেখতে পাবেন। ধর্ম্মভীরু যযাতিকে কৌশলে প্রণয়বন্দী করার জন্যে শর্ম্মিষ্ঠা বলেছেন—

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্! ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥১৬॥"

"নেতি। হে রাজন্! নর্ম্মযুক্তং পরিহাসান্বিতং পরিহাসসৌষ্ঠবসম্পাদকমিত্যর্থঃ, অনৃতং বচনম্, ন হিনস্তি বক্তারং জনং নানিষ্টভাজং করোতি। স্ত্রীষু তন্মনোরঞ্জনায় প্রযুক্তমনৃতং বচনং ন হিনস্তি। বিবাহকালে তদ্বাধানিবৃত্তয়ে প্রযুক্তমনৃতং বচনং ন হিনস্তি। সর্ব্বধনাপহারে রাজাদিনা সর্ব্বস্বহরণসম্ভাবনাসময়ে তন্নিবৃত্ত্যর্থং, বচনঞ্চ ন হিনস্তি। মুনয় এব ইমানি পঞ্চ অনৃতানি মিথ্যাবচনানি, অপাতকানি অপাপজনকান্যাহুঃ। এবঞ্চ বচনভূতস্য তদানীং তব মৌনস্য বিবাহকালিকত্বাদনৃতত্বেঽপি ন দোষঃ। অন্যথা দেবযান্যাঃ সপত্নীসম্ভাবনয়া শুক্রেণ তদ্দানাভাবে বিবাহবাধৈব স্যাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥"ক

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে, আদিপর্ব্বের সঙ্গে মুদ্রিত 'যুধিষ্ঠিরের সময়'* নামে প্রবন্ধমালার প্রতি মনোযোগক্ষেপ করা দরকার। যুধিষ্ঠিরের সময়, ভারতযুদ্ধের ঐতিহাসিকতা, মহাভারতের রচনাকাল—এসব বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা একাধিক শিবিরে বিভক্ত। তর্ক-তরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে তর্কাতীত সিদ্ধান্তের উপকূলে পণ্ডিতেরা এখনও পৌঁছতে পারেন নি। হরিদাসের সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা তাই মুলতুবী রাখা যেতে পারে। কিন্তু কোনো তর্কের ভয় না করে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে প্রবন্ধগুলি হরিদাসের ভূরিজ্ঞান ও বিশ্লেষণী-বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বিশেষ করে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান যে-কোনো পাঠককেই অভিভূত করবে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে ধুরন্ধর জ্যোতিষী হরিদাস যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের জন্মপত্রিকা, তাঁদের কোষ্ঠীর ফলাফল ও রাশিচক্র সংগ্রহ এবং বিচার করে 'মহাভারতম্'-এর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাশিচক্র (প্রতিলিপি), কোষ্ঠী ও তার ফলাফল উদ্ধার করে দেওয়া হ'ল।

"অথ যুধিষ্ঠিরস্য জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী)"

কল্যব্দারম্ভাৎ পূর্ব্বাতীতাব্দাদয়ঃ ৭২।৭।২৯।

(অর্থাৎ অদ্য ১৮৫২ শকাব্দের ও ১৩৩৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর হইতে ৫১০৩ (পাঁচ হাজার একশত তিন) বৎসর পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল) *

৫০৩১ এতদ্বর্ত্তমান কল্যাব্দরম্ভাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিনি ত্রিশপ্ততিতমে অব্দে, জ্যৈষ্ঠে মাসি, শুক্লে পক্ষে, পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ, দিবা ষোড়শ দণ্ড সময়ে, শুভ সিংহ লগ্নে, রবেঃ ক্ষেত্রে, উচ্চস্থে শনৌ, কেন্দ্রস্থেষু রবি-গুরু বুধ-চন্দ্রেষু, ত্রিকোণস্থে ভৃগৌ কুজে চ, অষ্টোত্তরীয়মতে শনের্দ্দশায়াম্, বিংশোত্তরীয়মতে চ বুধস্য দশায়াং হস্তিনাধিপতি মহারাজাধিরাজ-শ্রীযুক্ত-পাণ্ডুবর্ম্মণঃ শুভ-প্রথম কুমারো জাতবান্। রাক্ষসগণোঽয়ং বিপ্রবর্ণশ্চেতি।

রাশিচক্রম্ (*)

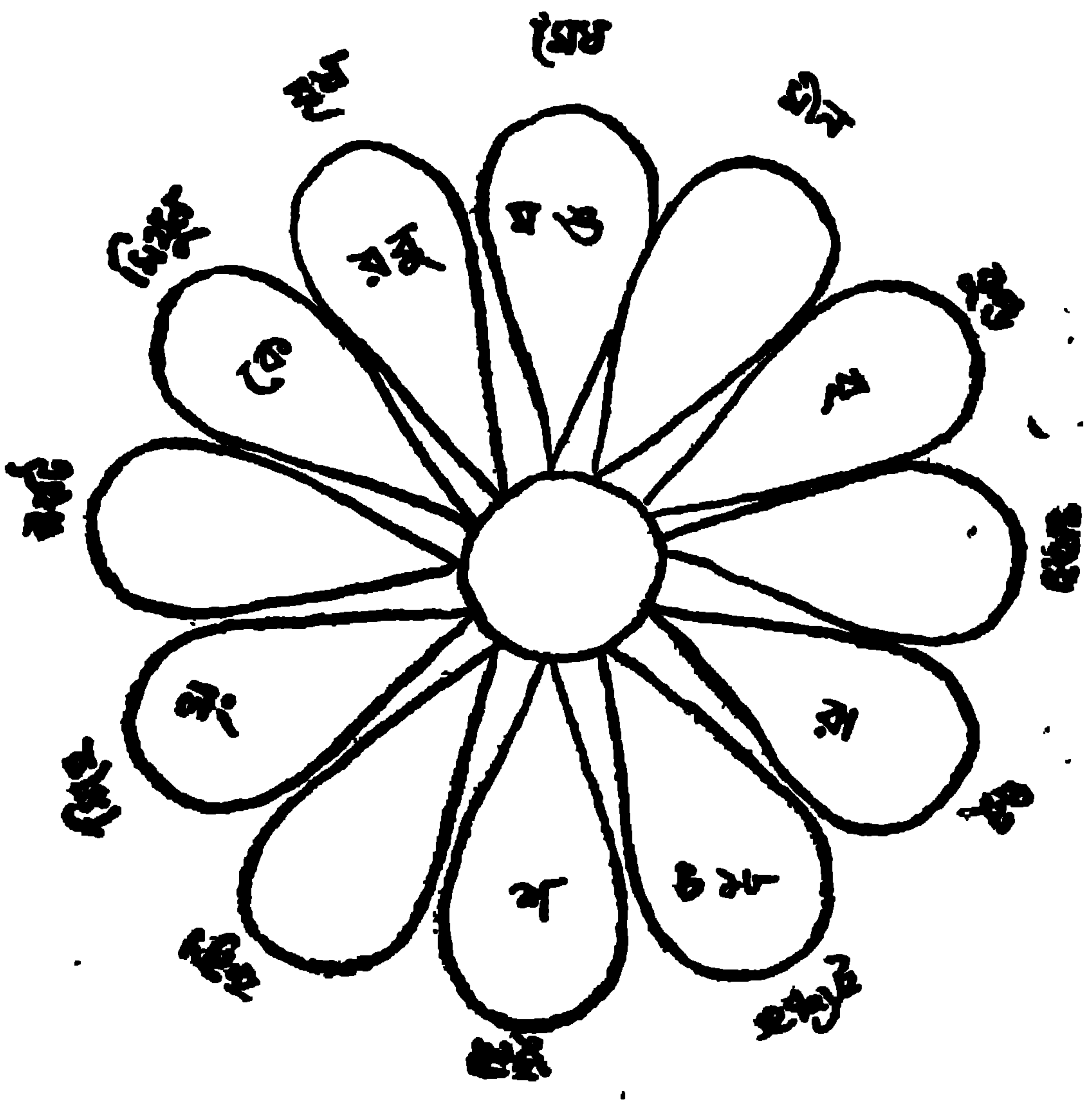

রের কোষ্ঠীর ফল।

[বৃহৎপারাশর-হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত]

১। অসাধারণ ধার্ম্মিক, ধীর, মিতভাষী, বন ও পর্ব্বতচারী, জ্ঞানী, সুশীল এবং রাজা বা প্রসিদ্ধ লোক হয়।

২। ধনবান্ অথ চ পুত্রহীন (পরাশরসংহিতা ১০৪ শ্লোক)

৩। ভ্রাতৃগণ উৎকৃষ্ট এবং অনুকূল ; কিন্তু অধিক বয়সে ভ্রাতৃহানি।

৪। মানসিক অশান্তি, শেষ বয়সে মঙ্গলের দশায় রাজ্যলাভ, বিষ্ণুভক্তি এবং বাহুবলে বিত্তলাভ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত—দশমস্কন্ধ—তৃতীয়াধ্যায়ের ৭—৮ শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'খমাণিক্য' নাম জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন রাশিচক্রের গ্রহসংস্থান জানা যায়। যথা—

"উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌম-চান্দ্রি-শনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ
সিংহ-তুলালিষু-ক্রমবশাৎ পূর্ষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥"

৫। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং বংশহীন।

৬। আত্মীয়-স্বজনের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বৈরভাব।

৭। দেব-দ্বিজ প্রীতিকারিণী পত্নী, বিশিষ্ট বুদ্ধি, পিতৃ-পিতামহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বিনয়, মন্ত্রণা-নৈপুণ্য, শত্রুজয় এবং ধার্ম্মিকতা।

৮। দীর্ঘ আয়ু ও দেবলোকপ্রাপ্তি (পরাশরসংহিতা ১০১ শ্লোক)।

৯। প্রবল রাজযোগ, অতিকষ্টে ভাগ্যোদয়, বহুভ্রাতা, বিক্রম, উদ্যম এবং ভাগ্যোন্নতিকালে বন্ধুজন হইতে সাহায্যলাভ।

১০। সমস্ত চেষ্টা সফল, প্রিয়জন বিচ্ছেদ, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা, বীরত্ব, কৌলিন্য, ধন, যশ, পরস্বাপহরণ, জিগীষা, মনুষ্যমধ্যে প্রাধান্য এবং সেনাপতিত্ব।

১১। সৌভাগ্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, পুত্রনাশ, চতুর সত্যবাদিতা, চতুর ধার্ম্মিকতা, রাজপূজা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা।

১২। যজ্ঞাদিকার্য্যে ও দেব-দ্বিজপ্রীত্যর্থে বহু ব্যয়, সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং এই সকল কারণে সর্ব্বত্র প্রশংসালাভ।”*

অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-বেদনা, পোষ-ফাগুনের মত পালা করে এসেছে ও গেছে। একদিকে রাজসম্মান ও দেশবাসীর অভিনন্দন তাঁকে আনন্দিত করেছে; আবার শোকতাপও তাঁকে পীড়িত করেছে। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে ‘মহাভারতম্’ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। তিনি

---

* “এই রাশিচক্র অত্যন্ত প্রমাণিত এবং হিন্দুস্থানীয় প্রত্যেক জন্ম-পত্রিকার উপরে ইহা অদ্যাপি লিখিত হইয়া থাকে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে যুধিষ্ঠির এক বৎসর, দুই মাস আট দিনের বয়োজ্যেষ্ঠ; ভীম চারি মাস দশ দিনের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অর্জ্জুন ছয় মাসের বয়ঃকনিষ্ঠ। ইহা মহাভারতের বচন হইতেই জানা যায়; তাহা ‘যুধিষ্ঠিরের সময়’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথমেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং যুধিষ্ঠির প্রভৃতির রাশিচক্রে গ্রহসন্নিবেশ করা নিতান্ত দুরূহ হয় নাই। তারপর যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম সম্বন্ধে মাস, তিথি, নক্ষত্র এবং লগ্ন উপরি উপরিউক্ত মহাভারতের বচনেই পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া সুপণ্ডি ও সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয় এই রাশিচক্র প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন এবং প্রবীণ জ্যোতির্বিৎ শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ এবং কলিকাতা রিপণ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, মহাশয় এই কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া মনোনীত করিয়াছেন।”

যথানিয়মে অর্থাৎ সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত টীকা ও বাংলা অনুবাদ রচনা করে গেছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ঘণ্টায় তিনি (টীকা, পাঠান্তর ও বাংলা অনুবাদসহ) এক পাতা করে প্রেসকপি এবং এক মাসে এক খণ্ডের মত প্রেসকপি তৈরী করতেন। এক ঘণ্টায় এক পাতা করে প্রেসকপি তৈরী করার কাহিনী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের মত মনীষীর কাছেও অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। তিনি একদিন হরিদাসের বাড়ীতে এসে প্রশ্ন করলেন—

"আপনি কত সময়ে ইহার এক একটি খণ্ডের প্রেসকপি প্রস্তুত করেন ?

আমি (হরিদাস)। এক এক মাসে।

হীরেন্দ্র। এক এক মাসে ! আপনি কি যুক্তযোগী না মহাতপা !

আমি। আমি যুক্তযোগীও নহি, মহাতপাও নহি ; আপনাদের ন্যায় সাধারণ গৃহস্থ মাত্র।

হীরেন্দ্র। যোগবলে বা তপস্যার বলে মনের সঙ্কল্পমাত্র না হইলে এই ১২৮ পেজের এক একটি খণ্ডের প্রেসকপি এক এক মাসে প্রস্তুত হয় কিরূপে ? সময় অনুসারে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি ব্যতীত মানুষের জীবন রক্ষা হয় না বলিয়া সমস্ত দিন-রাত্রি বসিয়া মানুষ লিখিতে পারে না। তারপর, আমি আপনা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমিও বাংলা ভাষায় ১৩ খানা বই রচনা করিয়া ছাপাইয়াছি। তাহার এক এক পেজের প্রেসকপি প্রস্তুত করিতে চারিদিন করিয়া সময় লাগিয়াছে।

আমি। আপনি দিন ও রাত্রির মধ্যে কোন্ সময়ে কয় ঘণ্টা লেখেন ?

হীরেন্দ্র। দিনে সকালে ৩ ঘণ্টা করিয়া লিখিয়া থাকি।

আমি। তাহা হইলে আপনি চার দিনে বার ঘণ্টায় একটি মাত্র প্রেসকপি প্রস্তুত করেন ?

হীরেন্দ্র। তাহাই।

আমি। আর আমি এক ঘণ্টায়।

হীরেন্দ্র। কি প্রকারে ?

আমি। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রথমে কাগজের এক পৃষ্ঠায় উপরে মূল লিখিয়া রাখি। ইহাতে অর্দ্ধঘণ্টা যায়। তাহার পরে তামাক খাইবার সময় তাহার টীকা ও বঙ্গানুবাদ লেখ্য বিষয় ভাবিয়া স্থির করি। পরে হুকা রাখিয়া কলম ধরি, নদীর স্রোতের ন্যায় লেখা চলিতে থাকে ; অর্দ্ধঘণ্টায় এক পেজ প্রেসকপি

লেখা হইয়া যায়, পরে একবার পড়িয়া দেখি। এই ভাবে একঘণ্টায় একবার লেখাতেই আমার এক পেজ প্রেসকপি হইয়া যায়, তবে কঠিন হইলে অধিক সময় লাগে।……

হীরেন্দ্র। তাহা হইলে আপনি যুক্তযোগী বা মহাতপা না হইলেও সারস্বত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।…"*

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে বিস্মিত আবেগে লিখেছিলেন—"ইহার অর্থসম্পদ নাই, বিত্তশালী লোক সহায় নাই, কর্ম্মচারীদের ভিড় নাই, বসিবার চেয়ার নাই, রাখিবার টেবিল নাই, দেখিবার রাশীকৃত পুস্তক নাই, এমন কি কোন আড়ম্বরই নাই; আছে—বসিবার একখানি কটাসন বা কুশাসন, আর মুদ্রণসম্পাদনের, সহায় অল্প বয়স্ক একটি পুত্র এবং সামান্য ক'এক খানি আদর্শ পুস্তক। এই অবস্থায় উক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যুক্তযোগীর মত অনবরত লেখনী চালাইতেছেন, আর মূল, টীকা ও বাঙ্গালা লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বার লিখিবার অবসর নাই বা প্রয়োজন নাই, একবার লেখাতেই প্রেসকপি হইয়া যাইতেছে;…আমি এইরূপ ঘটনা জানিয়া বিস্মিত এবং মহাভারতের এই সংস্করণটি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।…"†

মহাভারতের রচনা ও প্রকাশনার কাজ যখন পূর্ণবেগে এগিয়ে চলেছে তখন এল মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা। ছাপার কাগজ প্রথম চোটেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। বছর পাঁচেক পরে যখন কাগজের দেখা মিলল, তখন তার দর প্রায় ছ'গুণ বেড়ে গেছে। এদিকে আবার দাঙ্গা ও অশান্তি—পথে-ঘাটে চলা-ফেরা নিরাপদ নয়। কাজেই বছর সাতেকের জন্যে মহাভারতের ছাপা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে অনেক গ্রাহক মারা গেলেন, কেউ বা কলকাতার বাসা তুলে দিলেন আর মহাভারতের ছাপা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে ভেবে অনেকে গ্রাহকতাই ছেড়ে দিলেন। জিনিষপত্রের দর অবিশ্বাস্য রকম চড়ে গেল; ফলে কম্পোজিটরের বেতন, দপ্তরীর মজুরী সবকিছুই বাড়াতে হ'ল। হরিদাস রীতিমত বিপন্ন বোধ করলেন, কিন্তু অবসন্ন হলেন না। মহাভারতের লেখার কাজ আগের মতই তিনি চালিয়ে গেলেন এবং 'ব্রাহ্মণজনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন' করলেন, অর্থাৎ সরকার ও দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। তাঁর আনুকূল্যকারী ও সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার, বিভিন্ন

সংস্থা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই লিখে রেখে গেছেন—

“এই মহাভারতপ্রকাশে আমার আনুকূল্যকারী মনীষীদিগের নাম

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী
রায়বাহাদুর শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
খুলনার উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি

আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও লোকসেবক পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে এই মহাভারত সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়া ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

এই মহাভারত প্রকাশে অর্থ সাহায্যকারী মহাত্মাদিগের নাম

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে	১০০০০ টাকা
শিক্ষামন্ত্রী আবুলকালাম আজাদ দিল্লী কেন্দ্রীয় সরকার হইতে	১০০০০ টাকা
শিক্ষামন্ত্রী আবুলকালাম আজাদ দিল্লী কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দ্বিতীয়বার	৭৫০০ টাকা
এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাকশন মামুদ সাহেব পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে দ্বিতীয় বার	৭৫০০ টাকা
অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় সরকার হইতে	৪০০০ টাকা
বেলিয়াঘাটার ডি, এন, বসু এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু	৩০০০ টাকা
কলিকাতা কর্পোরেশন	১০০০ টাকা
বিড়লা পার্কের শ্রীযুগলকিশোর বিড়লা	৫০০ টাকা
শ্রীরামপুরের শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	৪৭৫ টাকা
কলিকাতার শ্রীমৃগাঙ্কমোহন শূর ও শ্রীরামেন্দ্র শূর	৪৭৫ টাকা
,, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৩২৫ টাকা

কলিকাতার	শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০০ টাকা
,,	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্রগণ	২০০ টাকা
,,	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫০ টাকা
,,	ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৭০ টাকা
,,	কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	৫০ টাকা
,,	শরচ্চন্দ্র সরকার	৫০ টাকা
,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪০ টাকা
,,	শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০ টাকা
,,	ক্ষেত্রমোহন বর্ম্মণ	৪০ টাকা
,,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার	৪০ টাকা
,,	রামদয়াল মজুমদার	১০ টাকা
উকশা	খুলনার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ	১০ টাকা
কলিকাতার	বিষ্ণুপদ বিদ্যারত্ন	১ টাকা

একুন—৪৫,৭৭৬ টাকা"*

১৩৫৭ সনে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তাঁর মহাভারতের রচনা শেষ হ'ল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে হরিদাস তার ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"১৩৩৬ সাল ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার সকাল বেলায় মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করা হয় এবং ১৩৫৭ সনে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সকালে উহা সমাপ্ত হয়। সুতরাং ২০ বৎসর, ১০ মাস ১৭ দিনে মূল, টীকা, বাঙ্গলা ও পাঠান্তরাদিসহ সমগ্র মহাভারত লেখা শেষ হইল। ইহার মধ্যে আদিপর্ব্ব হইতে শল্যপর্ব্বের ১৯শ অধ্যায় পর্য্যন্ত আমার নিজের হাতে লেখা হইল; পরে চোখের দোষ হওয়ায় ডাক্তারগণের নিষেধে নিজে না লিখিয়া নিজে বলিয়া দিতাম, অন্য লেখক লিখিত॥ ১৩৫৭ সাল ২১শে আষাঢ়।

শ্রীহরিদাস শর্ম্মা।"

'মহাভারতের ইতিহাস'এও তিনি রচনার বিবরণ দুটি শ্লোকে লিখে গেছেন। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ পঙক্তিটি হ'ল—'একঃ খল্বহমেকবিংশতিমিতৈর্ব্বর্ষৈরকার্ষং সুখাৎ"†। (অর্থাৎ এই সকল বিষয় আমি এককই একুশ বৎসরে, প্রায় একুশ বৎসরে, অনায়াসে করিলাম)। নিজের কর্ম্মকীর্ত্তির একটি বিবরণ তিনি স্বর্গারোহণপর্ব্বের 'নিবেদন'-এ লিখে রেখেছেন। লেখার কারণ দেখিয়ে তিনি

বলেছেন— "…কিন্তু আমার অসমক্ষে কিংবা পরবর্ত্তীকালে কেহ বিভিন্ন 'হরিদাস' কল্পনা না করেন, এই জন্য এই ইতিহাস আমিই লিখিলাম।" কীর্ত্তিধর কবি ও সাহিত্যিকদের ভাগ্যে এ রকম বিপর্য্যয় ঘটা যে সম্ভব তা তিনি জানতেন। সে যাহোক তাঁর অলৌকিক জ্ঞান ও কর্ম্মযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হ'ল অবশ্য 'মহাভারতম' এর প্রকাশনার শুভসমাপ্তির পর—১৩৬৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ রচনা সমাপ্তির প্রায় ন' বছর পরে। পূর্ণাহুতির শুভসূচনাতেই অর্থাৎ শেষ ফর্ম্মা প্রেসে যেতে না যেতেই এ সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীতে; বেজে উঠল জয়ডঙ্ক। সংবাদপত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হ'ল ঋষি হরিদাসের সাধনার আশ্চর্য্য কাহিনী। সেদিনের দেশজোড়া আবেগ ও আনন্দপ্রবাহের রেশ এখনও যেন জড়িয়ে আছে বিবর্ণ সংবাদপত্রগুলির ভাঁজে ভাঁজে। 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তরে'র অংশ বিশেষ তাই তুলে দিলাম—

"…ম্লান গোধূলির আলোয় ত্রিতলের এক নিভৃত কক্ষে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি যেন চলে গিয়েছিলাম কোন্ এক প্রাচীন ঋষির তপোবনে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে শ্বেত উপবীত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, চোখে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি—সে দৃষ্টি শুধু দুরূহ তত্ত্বের অভ্যন্তরে নয়, হৃদয়ের অন্তরস্থলও ভেদ করে যায়।…

লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে এবং একাধিক পণ্ডিতের পরিশ্রমে যে কাজ সম্পূর্ণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, ঠিক সেই কাজেই হাত দিয়েছিলেন সিদ্ধান্তবগীশ মহাশয়। লোকবল, অর্থবল কিছুই নেই, আছে শুধু দুর্জ্জয় সাহস আর সাধকের নিষ্ঠা। সেই সাহস ও নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে তিনি নিজের চোক্ষে দেখে যেতে পারলেন মহাভারতের স্বকৃতটীকা, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীনটীকা ও পাঠান্তরসহ প্রায় ৫০ হাজার পৃষ্ঠায় ১৫৯ খণ্ডে লেখা মহাভারতের নবতম সংস্করণ…"

[আনন্দবাজার, ২রা জৈষ্ঠ, ১৩৬৬]

"…কিন্তু এই সর্ব্বপ্রথম সটীক অনুবাদ মূল শ্লোক সমন্বিত সমগ্র মহাভারতের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই প্রয়াস অতুলনীয় অনন্যসাধারণ নিশ্চয়ই। পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট হইতে বহু অর্থব্যায়ে বহু পণ্ডিতের চেষ্টায় মহাভারতের বহু পাঠান্তর মিলাইয়া যে সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে, পণ্ডিতজনের গবেষণার দিক হইতে তাহারও মূল্য অসীম। কিন্তু একই সঙ্গে দেশের সাধারণ পাঠক ও পণ্ডিতজনের জ্ঞানলিপ্সা ও রুচিকে তৃপ্ত করার যে চেষ্টা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মহাভারতে হইয়াছে তাহা দেশের প্রাজ্ঞ ওবিদ্বজনেরা

একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।…

এই গ্রন্থ যদি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইত—তবে ইহা সারা ভারতে প্রচারের স্থবিধা ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যবসায় মনোভাব ছিল না, বাংলাকে মহাভারতের অমৃত কথা বিলাইবার আকাঙ্ক্ষাটুকুই ছিল, সেইজন্ত তিনি বাংলায় এই মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন।…”

[যুগান্তর, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ সন]

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ব্যসকূটের বিশ্লষণে ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার বাখ্যায় হরিদাস তাঁর শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির ও রচনাচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় রেখে গেছেন। ব্যাসকূটের বিশ্লেষণের আলোচনা আমার পক্ষে একান্তই অনধিকারচর্চ্চা। তাই একটি বিখ্যাত ব্যাসকূট ও তার টীকার অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলাম। ব্যাখ্যা সম্ভবমত সরল হয়েছে কি না, সে বিবেচনার ভার পাঠকদের।—

“তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তঃ ॥৩॥
তেষামভ্যাধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
এয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৪॥”

“ভারতকৌমুদী

সকারণাং কালবৃদ্ধিমাহ তেষামিতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। পঞ্চমে পঞ্চমে ইতি বীপ্সানুসারাৎ দ্বাবিত্যত্রাপি বীপ্সাঽকান্তব্যা। তথা চ জ্যোতিষাং গ্রহাণাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোরিত্যর্থঃ, ব্যতিক্রমাৎ নির্দ্দিষ্টগমন ব্যত্যয়াৎ, তেষাং প্রাগুক্তানাং চান্দ্রদিনমাসানাম্, কালাতিরেকেণ অবয়বভূতচান্দ্রদণ্ডদিনাধিক্যেন হেতুনা, পঞ্চমে পঞ্চমে, বর্ষে সৌরে সাবনে বা বৎসরে, দ্বৌ দ্বৌ, চান্দ্রৌ মাসৌ, উপচীয়ত উপচীয়েতে বর্দ্ধেতে ইতি যাবৎ। কর্ম্মকর্ত্তরি পরস্মৈপদমার্ষম্।

তথা চ মলমাসতত্ত্ব ধৃতং জ্যোতিষবচনম্—‘দিবসস্য হরত্যর্কঃ ষষ্টিভাগ মৃতৌ ততঃ। করোত্যেকমহশ্ছেদং তথৈবৈকঞ্চ চন্দ্রমাঃ॥ এবমর্দ্ধতৃতীয়ানামব্দানামধিমাসকম্। গ্রীষ্মে জনয়তঃ পূর্বং পঞ্চাব্দান্তে তু পশ্চিমম্॥” অস্য ব্যাখ্যানঞ্চ মলমাসতত্ত্বাদৌ দ্রষ্টব্যম্। ষষ্টিদণ্ডৈর্দিনে বিধাতব্যে রবিঃ সোমশ্চ একষষ্টিদণ্ডৈস্তৎ বিদধাতি। তেন চৈকৈকস্মিন্ দিনে দণ্ডদ্বয়বৃদ্ধ্যা ঋতৌ দিনদ্বয়ং বর্দ্ধতে। ততশ্চ বর্ষে দ্বাদশদিনবৃদ্ধিঃ। তত্র চ সৌরদিন বৃদ্ধ্যাপি চান্দ্রদিন বৃদ্ধিরেব পর্য্যবস্যতীতি বর্ষে দ্বাদশতিথিবৃদ্ধিঃ। ‘তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্’ ইতি সূর্য্যাসিদ্ধান্তঃ। এবঞ্চৈকস্মান্মলমাসাৎ পরং প্রথমে বর্ষে দ্বাদশ, দ্বিতীয়েঽপি দ্বাদশ, তদুত্তরমাসষট্‌কে চ ষট্

তিথয়ো বর্দ্ধন্ত ইতি মেলনাৎ ত্রিংশত্তিথ্যাত্মকো মলমাসো নাম একো মাসঃ সার্দ্ধবর্ষদ্বয়াৎ পর ভবতীতি নিয়তম্। তেন চ একস্মিন্ সার্দ্ধবর্ষদ্বয়ে একো মাসো বর্দ্ধতে, পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ, দশমে চত্বারঃ, সার্দ্ধদ্বাদশবর্ষে চ পঞ্চমাসা বর্দ্ধন্ত ইতি ফলিতম্ ॥৩॥

ইদানীমুক্তবৃদ্ধিফলেন চান্দ্রগণনয়া প্রতিজ্ঞাতানাং ত্রয়োদশানাং বর্ষাণাং পূর্ত্তিমাহ তেষামিতি। অভ্যধিকা উক্তক্রমেণ মলমাসরূপতয়া অতিরিক্তীভূতাঃ পঞ্চমাসাঃ, দ্বাদশ ক্ষপা অহোরাত্রাশ্চ দ্বাদশসু বর্ষেসু দ্বাদশরবিভুক্তিনিবন্ধনাঃ সঞ্জাতা দ্বাদশ তিথয়শ্চেত্যর্থঃ, তেষাং প্রতিজ্ঞাতানাং এয়োদশানাং বর্ষাণাং পূর্ত্তৌ প্রবর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ। ইতি মে মতিরুপলব্ধি বর্ত্ততে।

অত্র বিশেষ বিদুষো ভীষ্মস্যায়মাশয়ঃ—সৌরবৈশাখস্য প্রথমদিনে মেষলগ্নস্য প্রথমপল এব রবিরুদেতি, ততস্তস্মিন্নেব চ বর্ষে সৌরচৈত্রস্যান্তিমদিনে মীনলগ্নস্যান্তিমপল এব চাসাবুদয়ং লভতে; মেষাদিমীনান্তানাং দ্বাদশানাং লগ্নানাং মানঞ্চ ষষ্টিদণ্ডাঃ; রবেস্তদতিক্রমশ্চ রবিভুক্তিরিত্যুচ্যতে, তন্নিবন্ধনঞ্চ একং দিনং বর্দ্ধতে। ততশ্চাপি বর্ষে একতিথিবৃদ্ধ্যা দ্বাদশসু বর্ষেসু দ্বাদশতিথিবৃদ্ধিঃ।…”৭

সবশেষে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার অমৃতময় কথা। “আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্য্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারতইতিহাসের চরমতত্ত্ব।” * আর সেই সমন্বয়শাস্ত্রের উপসংহারশ্লোকে শ্রীমুখে ধ্বনিত হয়েছে ঈশ্বরশরণতার মঙ্গলনির্দ্দেশ। হরিদাসের টীকাসহ এ শ্লোকটির আলোচনা করে আমরা এ পুণ্য প্রসঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারি।—

“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥”

“সর্ব্বেতি। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বধর্ম্মান্ অগ্নিহোত্রাদীন্ বর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচর্য্যাদীনাশ্রমধর্ম্মান্ তীর্থস্নানাদীন্ সাধারণধর্ম্মান্ সম্ভাব্যমানানপরান্ ধর্ম্মাংশ্চ, পরিত্যজ্য সন্ন্যস্য, একমনন্যং মাং পরমাত্মানম্, শরণাশ্রয়ম্, ব্রজ প্রাপ্নুহি। অথ তথাত্বে নিত্য কর্ম্মপরিত্যাগাৎ প্রত্যবায়ো ভবেদিত্যাহ অহমিতি। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো নিত্যকর্ম্মাকরণনিবন্ধনেভ্যঃ পঞ্চসূনাদিজনিতেভ্যশ্চ পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি

মোচয়িষ্যামি। মচ্ছরণপ্রাপ্তিরেব পাপমুক্তিহেতুরিত্যাশয়ঃ। অতএব মা শুচঃ পাপনিমিত্তং শোকং মা কার্ষীঃ ॥৬৬॥"*

হরিদাসের দ্বাদশতম পূর্ব্বপুরুষ পূজ্যপাদ পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য্য অদ্বৈত বেদান্তাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর ভগবদ্গীতার অনবদ্যটীকা 'গূঢ়ার্থদীপিকা'র উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। তাঁরই ঐশ্বর্য্যের ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হরিদাস। তিনি অবশ্য ভগবদ্গীতাসহ অষ্টাদশপর্ব্বী সমগ্র মহাভারতের টীকা করেছেন। সে দিক থেকে দেখলে গীতাপ্রসঙ্গে 'গূঢ়াথদীপিকা'র সঙ্গে 'ভারতকৌমুদী'র তুলনা করা বোধহয় সঙ্গত হয় না। আর তা করার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। অমরা শুধু গীতার সমাপ্তি শ্লোকের ব্যাখ্যার অংশবিশেষ উদ্ধার করে এইটুকুই নিবেদন করে যেতে চাই যে মধুসূদনের তত্ত্বোজ্জ্বলা টীকা 'গূঢ়ার্থদীপিকা' হয়ত হরিদাসকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু অভিভূত করে নি।—

"…অধুনা তু ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। কেচিদ্বর্নধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানানবিদ্যনানান্‌বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং ফলদাতরং চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা কিং তৈরন্যসাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব ত্বন্যনিরপেক্ষাদহং কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবন্তমনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব, ইদমেব পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচারপূর্ব্বকেন প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ।… তস্মাৎ সন্নাসধর্ম্মেষ্বপ্যনাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রে তাৎপর্য্যং ভগবতঃ। যস্মাত্ত্বং মদেকশরণঃ সর্ব্বধর্ম্মানাদরেণ অতোঽহং সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকরিত্বাত্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো বন্ধু বধাদিনিমিত্তেভ্যঃ সংসারহেতুভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিনৈব—'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি' ইতি শ্রুর্ত্তেধর্ম্মস্থানীয়ত্বাচ্চ মম। অতো মা শুচঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য মম বন্ধুবধাদিনিমিত্তপ্রত্যবায়াৎ কথং নিস্তারঃ স্যাদিতি শোকং মা কার্ষীঃ।…"ক

॥ ছয় ॥

কাল ও ঘটনাস্রোত স্তব্ধ হয়ে থাকে না—তপস্যারত ঋষির সম্মানেও নয়। হরিদাস যখন 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় মগ্ন, তখন ঘটনার বহু বিচিত্র তরঙ্গ বয়ে গেছে—ঘরে ও বাইরে। তাছাড়া 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার পরেও হরিদাসের জীবনদেবতা তাঁকে কর্ম্ম ও সৃষ্টির জগৎ থেকে বিদায় নিতে দেন নি। সে সব কথাই আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

শুভ ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৬ সনে মহাভারত সম্পাদনার কাজ শুরু হয় ৪১নং স্থরি লেনের বাড়ীতে। তখন সেখানে প্রেস বসাবার তোড়জোড়ও চলেছে। ১৩৩৬ সনের ১৪ই কার্ত্তিক থেকে নিজের বাসার প্রেসেই 'কম্পোজ' করার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ছাপা তখন হ'ত অবশ্য 'আবদুল লতিপে'র প্রেসে। এর অল্পদিন আগে, ১৩৩৬ সনের ২৬শে বৈশাখ তাঁর বাসাতেই 'সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়' নামে একটি টোল বা চতুষ্পাঠী, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধ্যাপনার গুরুতর দায়িত্বও হরিদাস পালন করে চলেছেন। ১৩৩৭ সালে তাঁর টোল থেকে তিনটি ছাত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিল। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—একের পর এক সব কিছুই, বিধাতার অমোঘ নিয়মে ঘটে চলেছে এরই মাঝে মাঝে। ছেলে ও মেয়েদের বিবাহ হয়েছে যথাসময়ে; নাতি-নাতনীও এসেছে ঘর আলো করে। সে সব খবর ছড়িয়ে আছে হরিদাসের ঘটনাপঞ্জীর পাতায় পাতায়। এখানে শুধুমাত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির উল্লেখ করার অবকাশ আছে। ১৩৩৮ সনের ২৭শে চৈত্র শনিবার হরিদাসের সংসারে এল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, পরেশ। ১৩৩৯ সাল হরিদাসের জন্য নিয়ে এল তখনকার পণ্ডিতদের বহুবাঞ্ছিত রাজসম্মান—'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি। ১৩৩৯ সনের ১৮ই পৌষ (ইং ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৩ সাল) প্রচারিত হ'ল এ শুভসংবাদ—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকে ভারত সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারত সরকার এই উপাধি দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচ্যবিদ্যায় প্রসারকল্পে বিশেষ স্মরণীয় অবদানের জন্যেই ভারতীয় পণ্ডিতদের এই উপাধিতে ভূষিত করা হ'ত। হরিদাসকে লক্ষ্য করে এ-প্রসঙ্গে বাংলার লাট-সাহেব তাঁর সনদদানের দরবারে যা বলেছিলেন তার বাংলা হ'ল—"আপনি শুধু

বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও পারদর্শী গবেষক নন। আপনি একজন খ্যাতকীর্ত্তি কবিও বটে। উচ্চ পদাধিকারে প্রতিষ্ঠিত আপনার ছাত্রের সংখ্যাই আপনার অধ্যাপনার অসাধারণ সাফল্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর আপনার পাণ্ডিত্যের ও সারস্বতসাধনার সন্ধান পাওয়া যাবে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে।"*

সাধারণতঃ এ রাজ-সম্মান ও স্বীকৃতি আসত পণ্ডিতদের জীবনের একেবারে শেষ ভাগে। হরিদাস কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই। তাঁর এ গৌরবে দেশবাসীরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। দলে দলে জ্ঞানী ও গুণী লোকেরা হরিদাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কলকাতার বিভিন্নস্থানে সভাসমিতিতে সাধারণ্যে অভিনন্দিতও হয়েছিলেন হরিদাস। সে সব সভা-সমিতির বিবরণ দেবার অবকাশ এখানে নেই। অভিনন্দনের প্রথম মালাটি তিনি পেয়েছিলেন ১৩৩৯ সালের ২৩শে পৌষ—গীতাসভায়, ৩নং চুনাপুকুর লেন, কলকাতা। আর সে সভায় সভাপতি ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ, হরিদাসের অকৃত্রিম সুহৃদ। বহু অভিনন্দনপত্রও তিনি পেয়েছিলেন দেশ-বিদেশ থেকে। হরিদাস প্রসন্ন পরিতৃপ্তির সঙ্গে এ সব কথা ঘটনাপঞ্জীতে লিখে রেখে গেছেন। বড় প্রয়োজন ছিল তখন হরিদাসের এ রাজসম্মানের। কলকাতার পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে তখন সবেমাত্র তাঁর পরিচয়ের পালা সুরু হয়েছে। সাহিত্যের দরবারে তিনি তখন সুপরিচিত, কিন্তু নিঃসংশয়ে সর্ব্বপ্রধান নন। একটি রীতিমত ভরা সংসারের ভার তাঁর ওপর এবং ভরসা শুধু বই বিক্রীর টাকাগুলি। সবার ওপরে আছে মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ রচনার তপশ্চর্য্যা। সক্রিয় সমর্থক দু'জন—স্যার দেবপ্রসাদ ও কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী। এই সন্ধিক্ষণে রাজসম্মানের দীপ্তি অপসারিত করেছে হরিদাসের মনের অনিশ্চয়তার বিষণ্ণ অন্ধকার আর আলোকিত করেছে পণ্ডিতসমাজে তাঁর জয়যাত্রার পথ। কিন্তু এই সম্মান-যোগের পরেই বিধাতা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন শোক-তাপের মাধ্যমে। কিন্তু শোকে বা সম্মানে মহাভারতের সাধনা থেকে তিনি দূরে সরে যান নি। ১৩৪০ সালের ১৯শে বৈশাখ তাঁর নাতনী 'স্নেহের পুতুলী' রেবা (হেমচন্দ্রের মেয়ে) কলেরা রোগে মারা যায়। আবার ঐ সালেই তাঁর ছোট ছেলে 'সোনারচাঁদ' পরেশ (এক বছর সাত মাস বয়সে) মা'র কোল খালি করে চলে গেছে। আঘাত নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন হরিদাস, ঝিন্তু তা বোঝার কোনো উপায় নেই। তিনি তখন সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন—মহাভারতের পর্ব্বগুলির একের পর এক টীকা ও

বঙ্গানুবাদ করে চলেছেন। ১৩৪১ সালের ১৩ই শ্রাবণ কলকাতা সংস্কৃত কলেজ এসোসিয়েশর্নের কার্য্যকরী সমিতি দারুণ মতভেদের মধ্যে ‘রুক্মিণীহরণ’কে কাব্যের মধ্যপরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত করেন। সভাশেষে, সভাপতি হাইকোর্টের জজ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হরিদাসকে ‘মহাকবি’ বলে অভিনন্দিত করেন। স্যার দেবপ্রসাদ কিন্তু হরিদাসকে বলেছিলেন যে পণ্ডিতেরা এই উপাধি মেনে নিলে তবেই যেন তিনি নিজে তা ব্যবহার করেন। হরিদাস তাঁর এই অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা মনে রেখেছিলেন। পরে ১৩৪৩ সালে ‘ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলে’র বার্ষিক অধিবেশনের পর তিনি মহাকবি উপাধিটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন হরিদাস। ১৩৪৩ সালের আষাঢ় সংখ্যার ‘সময়িক প্রসঙ্গে’ মাসিক বসুমতী জানাচ্ছেন—“গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার কলকাতায় এক পণ্ডিত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন সাধু সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীযুত দামোদরলাল শাস্ত্রী আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।” বৃন্দাবনের দামোদর শাস্ত্রী ও কলকাতার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সে অধিবেশনে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে সংস্কৃতই ভারতের সাধারণ ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হোক। এই অধিবেশনে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী হরিদাসকে ‘মহাকবি’ বলে প্রকাশ্যে সম্বোধন করেন। হরিদাস তখন থেকেই ‘মহাকবি’ উপাধিটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। তার আগে শান্তিপুরের ‘বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ’-এর ১৩৪২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে হরিদাস ছিলেন সভাপতি। তিন দিনের অধিবেশনের শেষে, সেই সভাই তাঁকে ‘ভারতাচার্য্য’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এর মাঝে মাঝে বিভিন্ন পণ্ডিতসমাজের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যথোচিত মর্য্যাদার সঙ্গে তাঁর নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালনও করেছেন। কিন্তু মহাভারতের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা এবং সম্পাদনার কাজকে তিনি দিয়েছেন অগ্রাধিকার। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি হুঁশিয়ারই ছিলেন। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁর পরিশ্রমের মাত্রা ছিল অনেক বেশী। তাই ষাটের পর শরীর মাঝে মাঝেই আপত্তি জানিয়েছে। ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ সনে তাঁর চোখের দোষ রীতিমত বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মহাভারত লেখা চলেছে অব্যাহতভাবে। ১৩৪৫ সালের ৪শে চৈত্র নিখিলবঙ্গ পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতার এলবার্ট হলে। অভ্যার্থনাসভাপতির ভূমিকায় ছিলেন হরিদাস। তাঁর অভিভাষণে তিনি অনেক প্রশ্নেরই আলোচনা করেছেন, যেমন—‘বৈদিক কাহারা?’, ‘আর্য্য শব্দের

অভিধানিক অর্থ কি ?', 'আর্য্যদের আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল ?' ইত্যাদি। আর্য্যদের আদিম বাসস্থান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে দিলাম— "...শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— 'স ওঘ উত্থিতে নাবমাপেদে, তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ। তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব'। ইহার অর্থ—জলপ্রবাহ উত্থিত হইলে মনু নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া দিলেন। মৎস তাঁহাকে লইয়া চলিল, এইভাবে মনু মৎস্যের সাহায্যে অতি দ্রুতবেগে উত্তরপর্ব্বত হিমালয়ে গমন করিলেন। মনু যখন উত্তরদিক্স্থিত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বেদে লিখিত আছে, তখন বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুর বাসস্থান ভারতবর্ষেই ছিল, কেননা, ভারতবর্ষেরই উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত।..."

এদিকে ছোট বাসা বাড়ীটিতে কিন্তু তখন আর হরিদাসের কুলিয়ে উঠছিল না। বাড়ীটি একে ছোট, তার মধ্যে নীচের দুটি ঘর ত প্রেস ও প্রেসের জিনিষপত্রেই ঠাসা। কিছু টাকা তাঁর তখন হাতে জমেছে বটে, কিন্তু জমি কিনে বাড়ী তৈরী করার ঝঞ্ঝাট পোয়াবে কে ? তাই দালাল লাগিয়ে ইণ্টালি অঞ্চলে ৪১নং দেব লেনের একটি বাড়ী কেনাই স্থির করলেন। মূল্য ধার্য্য হ'ল ২০ ৫০০ টাকা। প্রয়োজনীয় লেখা পড়ার পর মিস্ত্রী ডেকে বাড়ীটি মেরামত করে নিলেন এবং গৃহপ্রবেশ করলেন ১৩৪৭ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ। এই বাড়ীতেই 'সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়' স্থানান্তরিত হয় এবং হরিদাসের বংশধরেরা এখানেই বসবাস করেন। ঘটনাপঞ্জীতে তিনি লিখে গেছেন— "১৩৪৭ সাল ৯ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৪০ সাল ২৩শে মে) তারিখে ৪১নং দেব লেনের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করা হইল। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য প্রায় সকলে ইহা বলিলেন 'যে কলিকাতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বাড়ীর মধ্যে ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই বাড়ীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বৃহৎ' ইত্যাদি...।" হরিদাস সেদিন সত্যিই খুশী হয়েছিলেন। হয়ত তখন তার সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে পড়েছিল যখন তিনি একেবারে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় এসে জীবিকার জন্যে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাঝে সাঝে সংসারের ওপর অশান্তির মেঘ জমেছে, কেটেও গেছে। অসুখ-বিসুখেও মাঝে মাঝে পড়েছেন হরিদাস। ১৩৪৯ সালে ত বেশ কিছুদিন তিনি রক্তআমাশয় ও গ্রহণী রোগে ভুগেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গেলেন ছাপরায়। সেখানে ১৩৪৯ সালের ৯ই ও ১০ই পৌষ 'নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদ'-এর অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব

করেন এবং তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন সংস্কৃত ভাষায়। অধিবেশনের প্রথম দিনে এক বিরাট শোভাযাত্রা সভাপতিকে নিয়ে নগর পরিক্রমা করে। আবার ১৩৫০ সালের চৈত্র মাসে মজঃফরপুরের ধর্ম্মসমাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নির্ব্বাচনের জন্যে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি সেখানে তিন দিন থেকে সুশৃঙ্খলে এ-দায়িত্ব পালন করেন। ফেরার সময় উমাশঙ্কর প্রসাদ (বাবু সাহেব) মহাভারতের জন্যে তাঁকে ৫০১ টাকা সাহায্য করেছিলেন। গোটা ভারতের সংস্কৃতপণ্ডিতসমাজে তখন হরিদাস যশে ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। মাস কয়েক আগেই কিন্তু তিনি এক দুঃসহ শোক পেয়েছেন। ১৩৫০ সালের ৫ই কার্ত্তিক তাঁর স্ত্রী কুসুমকামিনী সধবার সিঁদুর মথায় নিয়ে ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন। কুসুমকামিনীকে তিনি ঘরে এনেছিলেন সেই কবে—১৩০৭ সালে। এতদিনে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী কুসুমকামিনীর চিরবিদায়ের ক্ষণেও হরিদাস ধৈর্য্য ধরেই ছিলেন। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তিনিও চোখের জল ফেলেছেন। যোগেশবাবু আমাকে বলেছেন—"বাবার চোখে একদিনই আমি জল দেখেছি। মার মৃত্যুর সময় ও তার পরেও, যা কিছু করণীয় সবই বাবা আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গেই করেছেন। কিন্তু মা'র পারলৌকিক ক্রিয়ার সময় 'প্রেত' কথাটা বলতে গিয়ে থমকে গেলেন। তাকিয়ে দেখি যে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ধীর গম্ভীর বাবাকে তখন যেন কেমন অসহায় বলে মনে হল। আমরাও আর ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না।" সু-সন্তানবতী কুসুমকামিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ বিধিমতে ও উপযুক্তভাবেই হয়েছিল। ষোড়শ পণ্ডিতবিদায়, দান-ধ্যান, ব্রাহ্মণ ও সামাজিক ভোজনের বিরাট ব্যবস্থা করেছিলেন যোগেশবাবু এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন হেমচন্দ্র। এ শোকও তিনি সামলে গেলেন। ১৩৫১ সালে শুরুতে তিনি বসন্তরোগে মাস কয়েক ভুগলেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি আবার এক গুরুতর ধাক্কা পেলেন—তাঁর পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ১৩৫১ সালের ৮ই আশ্বিন রবিবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করেন। সেদিন দুর্গা-সপ্তমী। মাতৃভক্ত হরিদাস মায়ের আদ্যশ্রাদ্ধে বিধিমতেই দান-ধ্যান, বৃষোৎসর্গ, পণ্ডিতবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সবকিছু করেছেন।

১৩৪৯ সাল থেকেই আকাল চলছিল। ১৩৫০ সালে সে আকাল গিয়ে দাঁড়াল করাল দুর্ভিক্ষে। হরিদাস তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"১৩৫০ সালের বৈশাখ হইতে ১৮টাঃ, ২০টাঃ, ২৫টাঃ শ্রাবণ হইতে ৩৫টাঃ, ৪০টাঃ এবং ৪৭টাঃ ৮ আঃ পর্য্যন্ত চাউলের মণ আমরা কিনি। বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে উহা অপেক্ষাও অত্যন্ত বেশী দাম হইয়াছিল; শুনা গিয়াছে যে, ঢাকায় নাকি চাউলের মণ

১২৫টাঃ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল ; ইহাতে বঙ্গদেশের বহুলোক একাহারে, কদাহারে ও অনাহারে মরিয়াছিল…।" এই দারুণ দিনে তাঁর বাড়ীতে পনের দিন ধরে বহু দরিদ্র-নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর করিৎকর্ম্মা ছেলে 'শ্রীমান্ যোগেশ'।

'বঙ্গীয় প্রতাপ' নাটকটি হরিদাস অনেক আগেই লিখেছিলেন। ১৩৫২ সনের ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার নাটকটি প্রথমবার মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা রঙ্গালয়ে এবং দ্বিতীয়বার অভিনীত হয় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ১৩৫২ সনের ১১ই শ্রাবণ শুক্রবার। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী ইত্যাদি প্রায় সব সংবাদপত্রই নাট্যকার ও অভিনেতাদের অভিনন্দিত করেছিলেন। পরিচালনায় ছিলেন শ্রীযুক্ত শশীশেখর ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন (হরিদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এবং ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় যা বেরিয়েছিল, তা নীচে তুলে দেওয়া হ'ল—

আনন্দবাজার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

"সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ঃ

গত ২৩শে মে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিশেখর ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্নের পরিচালনায় উনশিয়া উদয়ন সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত নূতন সংস্কৃত নাটক 'বঙ্গীয় প্রতাপম্' মহা সমারোহে অভিনীত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল।"

আনন্দবাজার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৫২

"নূতন সংস্কৃত নাটকাভিনয় ঃ

গত ১১ই শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ২৭শে জুলাই, ১৯৪৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রণীত 'বঙ্গীয় প্রতাপং নাটকম্' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিশেখর কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্নের পরিচালনায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে পুনরায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। প্রতাপাদিত্যের কাহিনীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বীররসের নাটক হিসাবে ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বেণীসংহার ও মহাবীর চরিত নাটক অপেক্ষা কোন কোনও অংশে ইহার উৎকর্ষ দেখা যায়। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।"

যুগান্তর, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

"কলিকাতায় বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত নাটকাভিনয়

গত ২৩শে মে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে উনশিয়া উদয়ন সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত নূতন সংস্কৃত নাটক 'বঙ্গীয় প্রতাপম্' মহাসমারোহে অভিনীত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল। প্রতাপের ভূমিকায় শ্রীযুত ফণীভূষণ রায়, নান্দীর ভূমিকায় শ্রীযুত সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, শঙ্করের ভূমিকায় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় শ্রীযুত যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ভবানন্দের ভূমিকায় শ্রীযুত মুকুন্দলাল কাব্যতীর্থ, সুরেন ঘোষালের ভূমিকায় শ্রীযুত বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য, আকবরের ভূমিকায় শ্রীযুত শ্রীপতি কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, উদয়াদিত্যের ভূমিকায় ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবাসের ভূমিকায় শ্রীযুত কেনারাম ভট্টাচার্য্য, ও কল্যাণীর ভূমিকায় শ্রীযুত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত সনৎকুমার ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃত গানগুলি বিশেষ উপাদেয় হয়। শ্রীযুত শশিশেখর কাব্যতীর্থের পরিচালনা ও অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ভট্ট্যাচার্য্যের ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়।"

যুগান্তর, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫২

"সহর ও সহরতলী

সংস্কৃত নাটকাভিনয়

গত ১১ই শ্রাবণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রণীত 'বঙ্গীয় প্রতাপং নাটকম্' পণ্ডিত শ্রীযুত শশিশেখর কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্নের পরিচালনায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয়বার মহাসমারোহে অভিনীত হয়। প্রতাপাদিত্যের কাহিনীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বীররসের নাটক হিসাবে ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অভিনয় চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।"

ঘটনাপঞ্জীতে হরিদাস অভিনয়ের খরচ-খরচার যা হিসেব রেখে গেছে তা পড়তে ভালই লাগে—"মিনার্ভায় আমার খরচ ৩৭৮ টাকা এবং ষ্টারে আমার খরচ ২১৬ টাকা ১১ আনা ২ পয়সা। ষ্টারে সাহায্য পাওয়া গেল ১৫৫ টাকা। দুই অভিনয়ে মোট খরচ প্রায় ১১০০ টাকা, তন্মধ্যে আমার নিজ খরচা ৬১৫ টাকা ৯ আনা ২ পয়সা মাত্র।…" বোঝা যায় যে গানবাজনার মত অভিনয়ের দিকেও

হরিদাসের বিশেষ ঝোঁক ছিল। নাটকটি প্রথম ছাপা হয়ে বের হয় ১৩৫৩ সনের ১১ই বৈশাখ—ঘটনাপঞ্জীতে তাই লেখা আছে। বইতে অবশ্য বলা আছে ‘১৩৫২ বঙ্গাব্দে সৌরফাল্গুন মাসে।’ কয়েক মাসের এই গরমিলকে অবশ্য তেমন কিছু গুরুত্ব না দিলেও চলে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে নাটকটি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পরীক্ষায় এবং এর অংশবিশেষ বিশ্বভারতী এবং বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

‘বঙ্গীয় প্রতাপে’র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হরিদাস মাত্র চার মাস বার দিনে (১৩৫২ সালের ১৭ই আষাঢ় থেকে ২৯ কার্ত্তিকের মধ্যে) ‘মিবারপ্রতাপং’ নামে আর একটি নাটক রচনা করেন। এই নাকটিও সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল ষ্টার রঙ্গালয়ে, ১৩৫২ সনের ১৭ই ফাল্গুন। ইন্দিরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হরিদাসের অল্পবয়সী নাতনী আরতি (বর্ত্তমানে আরতি গুহ)। দাদুর শিক্ষাগুণে তিনি গড় গড় করে ‘ইন্দিরা’র কথা প্রাকৃতেই বলেছিলেন। এবারে অভিনয়ের সব ব্যবস্থাই করেছিলেন প্রাচ্যবাণী। হরিদাস অবশ্য নামমাত্র খরচ করেছিলেন। ১৩৫৫ সনের ২০শে কার্ত্তিক ইয়্যুভারসিটি ইনস্‌টিটিউট্‌ হলে ‘মিবার-প্রতাপং’-এর দ্বিতীয়বারের অভিনয়ও সুধীজনকে আনন্দিত করেছিল। সংস্কৃত নাটকের অভিনয় নতুন করে চালু করার জন্যে হরিদাস একটা আন্দোলনও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—অবশ্য এ-ব্যাপারেও যোগেশবাবুর সাংগঠনিক কুশলতার ওপরই ছিল তাঁর বিশেষ ভরসা। ১৩৫২ সাল না ঘুরতেই হরিদাস ‘শিবাজী চরিত’ নামে একটি মহানাটকের রচনা শুরু করেন। এরপর ‘সাহিত্যদর্পণ’-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল; ‘বঙ্গীয় প্রতাপ’ও ছেপে বের হয়ে গেল। কিন্তু ‘শিবাজীচরিতম্’ মহানটকের রচনা হরিদাস শেষ করলেন বেশ কিছু দিন পরে —১৩৫৩ সালের ১২ অগ্রহায়ণ। কারণ—১৩৫৩ সনের (ইং ১৯৪৬ সালের) দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সেদিন দেশবরেণ্য পণ্ডিত হরিদাসের নিরাপত্তার জন্যে দেশের অনেক মনস্বী ও যশস্বী পুরুষের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। প্রথমের দিকে শ্রাবণ মাসে হরিদাস কয়েক দিনের জন্যে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূদের নিয়ে স্যার দেবপ্রসাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন। শেষে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের অনুরোধে তিনি ছোট ছেলেকে নিয়ে কার্ত্তিক মাসে চার দিনের জন্য ভবানীপুরে শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্রের শ্বশুর, অধ্যাপক অক্ষয় ভট্টাচর্য্যের বাড়ীতে থাকেন।

এদিকে মহাভারতের কাজও তিনি করে চলেছেন যথানিয়মে এবং অনুশাসন-

পর্ব্বে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"জগদ্ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুন এত বিলম্ব হইল।"

১৩৫৩ সাল চলে গেল। এল নবজীবনের আশ্বাসভরা ১৩৫৪ সাল--ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। হরিদাস তাঁর ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"১৩৫৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট) তারিখে রাত্রি ১২টার পরে দিল্লীতে ভারতের বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।" হরিদাসের দেশাত্মবোধের কথায় আমরা ফিরে আসব তাঁর নাটকগুলির আলোচনা-মূলে। ১৩৫৪ সালের শেষে 'মিবারপ্রতাপ' নাটক ও 'বিয়োগবৈভব' খণ্ডকাব্যটি ছেপে বার হ'ল। ১৩৫৫ সালের শেষে হরিদাস ঘটনাপঞ্জীতে লিখেছেন—"১৩৫৫ সাল বড়ই দুর্ঘটনাময় ভাবে অতীত হইল।" কি সে দুর্ঘটনা তা আমরা জানি না। তবে এইটুকুই শুধু আমাদের নজরে পড়ে যে এই সনে এক মহাভারতের কাজ ছাড়া আর কিছু তিনি করে উঠতে পারেন নি। ১৩৫৬ সনে হরিদাস অনুশাসন পর্ব্বের বাকী অংশটুকু এবং গোটা আশ্বমেধিক পর্ব্বের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা শেষ করে, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ধরেছেন। ফাঁকে ফাঁকে 'স্মৃতিচিন্তামণি'র চতুর্থ সংস্করণ (৭ই ভাদ্র), 'রুক্মিণীহরণ'-এর চতুর্থ সংস্করণ (৭ই ভাদ্র। 'নৈষধচরিত' পূর্ব্বার্দ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ (২০শে কার্ত্তিক) প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের মনে পড়ে যে সাঁইত্রিশ বছর আগে ১৩১৯ সনে হরিদাস মাত্র ৩৫৭ টাকা ২ আনা খরচ করে একহাজার কাপি 'স্মৃতিচিন্তামণি' ছাপিয়ে ছিলেন। ১৩৫৬ সালে ছাপার খরচ বাড়তে বাড়তে ২১৭৩ টাকা ৪ আনা ২পয়সায় গিয়ে ঠেকেছে। ১৩৫৭ সন হরিদাসের জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ সালে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ 'স্বর্গারোহণে'র মূল লেখা ভারতকৌমুদী টীকা রচনা ও লেখা এবং পাঠান্তর লেখা' শেষ করেন। সমাপ্ত হ'ল বিরাট এক কর্ম্মযজ্ঞ, যার তিনি শুভ-সূচনা করেছিলেন ১৩৩৬ সনের ৩রা শ্রাবণ। সেদিনের প্রৌঢ় হরিদাসের নাম এখন বৃদ্ধের তালিকায় উঠেছে। কিন্তু তাঁর কর্ম্মশক্তি তখনও অটুট; প্রতিভার খরদ্যুতি তখনও অম্লান। এই সালেই ১৪ই আশ্বিন তিনি 'কাব্যকৌমুদী' নামে একটি অলঙ্কার গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। যথারীতি শেষের শ্লোকে তিনি বইটির রচনাকাল নির্দ্দেশ করে গেছেন (পক্ষাব্ধিনাগেন্দুমিতে শকাব্দে)। বইটি যে সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পূর্ণ এ কথাও হরিদাস গোড়াতেই বলেছে—

"সংক্ষিপ্তাপি চ পূর্ণাঙ্গী
সূত্রগ্রথিতহারিণী।

ধীমতা ধীয়তাং কণ্ঠে নব্যেয়ং
কাব্যকৌমুদী ॥”

কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধের চতুর্থ সংস্করণও ছাপা হ’ল ১৩৫৭ সনের ২৬শে ফাল্গুন। পরের বছর, ১৩৫৮ সনে (শাকেঽব্দে দহনাব্ধি-নাগ-বিধুমে), মাত্র দুমাস চোদ্দ দিনে (২০শে শ্রাবণ থেকে ২রা কার্ত্তিক), হরিদাস ‘বিত্তাবিত্তবিবাদং’ নামে একখানি খণ্ডকাব্য রচনা করলেন। খণ্ডকাব্যটির প্রথম ভাগে বিত্তা ও বিত্ত উভয়েরই নিন্দাবাদ করা হয়েছে; আর উভয়েরই প্রশংসা আছে উত্তর ভাগে। দুটি ভাগ থেকে এক একটি করে শ্লোক তুলে দিলাম। সরস, সরল অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ যোজনায় হরিদাসের নৈপুণ্যের নূতন করে প্রমাণ মেলে এই শ্লোক দুটীতে।—

“অর্থোঽসি ত্বং ধ্বতনরতনুঃ সর্ব্বথানর্থমূলং
ধর্ম্মধ্বংসী নরক পথকৃৎ কুপ্রবৃত্তিপ্রযোক্তা।
নীচং গন্তা মদমদনয়োঃ কারণং গর্ব্বহেতুঃ
দুর্ভাগ্যান্মে নয়নপথগঃ সাম্প্রতং সাধু হেয়ঃ ॥৭॥”

* * *

“গুরুতরমুখরে! কি ভুবিবাদেন তে স্যাৎ
নহি ধনমহিমানং নির্ধনা বুধ্যসে ত্বম্।
নন্থু বধিরসকাশে নিষ্ফলং বৈণগাণং
ভবতি বিফলমন্ধে চারুচিত্রেক্ষণঞ্চ ॥২১॥”

১৩৫৯ সনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা রচনা নেই। ১৩৬০ সনের ৩০শে শ্রাবণ (১৮৭৫ শকাব্দে শ্রাবণে মাসি) সরলা গদ্যকাব্য ও বিত্তাবিত্তবিবাদ খণ্ডকাব্যটি একসঙ্গে ছাপা হয়। বই দুটির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। সরলা গদ্যকাব্যটি তিনি লিখতে আরম্ভ করেন তিরিশ বছর বয়সে এবং শেষ করেন সাতাত্তর বছর বয়সে (সপ্তসপ্ত তৌ)—১৩৬০ সালে। ১৩৬০ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক সাহিত্য দর্পণের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সালের শেষ দিক থেকেই—হরিদাসের নিয়ম ও নিষ্ঠায় গড়া স্বাস্থ্য ভাঙতে আরম্ভ করে। ফাল্গুন মাসের প্রথমে রক্তের চাপ বেড়ে যায়, কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিকের চিকিৎসায় তিনি অবশ্য কিছুটা উপকার পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৩৬১ সালের ১২ই বৈশাখ তিনি আবার দুরারোগ্য কলেরার কবলে পড়েন। ডঃ নলিনীরঞ্জন সেন প্রমুখ চারজন খ্যাতিমান চিকিৎসকের চেষ্টায় তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু

স্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। কয়েক মাস যেতে না যেতেই ঘাড়ের ওপর একটা কার্ব্বাঙ্কল তাঁকে শয্যাগত করে ফেলে। ডঃ অমল সরকারের চিকিৎসায় তিনি সেরে ওঠেন। কিন্তু বার বার কালরোগে ভুগে ও জরার ভারে শরীর তখন তার একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৩৬১ সালের চৈত্রমাসে 'শিবাজীচরিতম্' মহানাটকটি ছেপে বার করার ব্যবস্থা করেন। আর সব শেষে মুদ্রাঙ্কিত হ'ল 'কাব্যকৌমুদী'—১৩৬২ সনের শ্রাবণ মাসে।

১৩৬৩ সনে তাঁর বাঁ-চোখের ছানি কাটানো হয়। ১৩৬৩ সনে দূরের ও কাছের দৃষ্টির জন্যে তিনি দুজোড়া চশমাও ব্যবহার করতে শুরু করেন। কিন্তু তাতে করে পড়বার বিশেষ সুবিধে হয় নি; লেখার কাজ অবশ্য কোনোরকমে চালিয়ে নিতে পারতেন। চোখের ওপর ধকল গিয়েছে অনেক, বারবার চোখের অসুখও হয়েছে—তাই তাঁর দৃষ্টি শক্তিই হ'ল জরারাক্ষসীর আংশিক প্রথম শিকার।

১৩৬৫ সালের ১৪ই আশ্বিন তিনি তাঁর 'মহাভারতের ইতিহাস' লেখা শেষ করেন। তিনি তখন বুঝতেই পেরেছিলেন যে এই লেখাই তাঁর শেষ লেখা। তাই অলঙ্কার গ্রন্থের প্রণেতা ও ব্যাখ্যাতা নিরলঙ্কার ভাষায় এবং বিষণ্ণ-গম্ভীর ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন—"সম্ভবতঃ এই ইতিহাস লেখাই আমার শেষ লেখা। কারণ, বয়স এখন ৮২ বৎসর, শরীর জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, মনের সে উদ্যম বা উৎসাহও নাই,…।" ১৩৬৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মহাভারতের শেষপর্ব্ব অর্থাৎ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব প্রকাশিত হবার সময় স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি তাঁর আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী কীর্ত্তন করেছেন এবং তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন আন্তরিক আবেগে ও অনুরাগে। দেশবাসীর এই অকুণ্ঠ অভিনন্দনে এবং নিজের দুশ্চর সাধনার সিদ্ধিতে হরিদাস পেয়েছিলেন গভীর তৃপ্তিময় আনন্দ; সেই আনন্দের আবেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি।

সম্মান ও স্বীকৃতির পালা কিন্তু তখনও মোটেই শেষ হয় নি। ১৩৬৭ (শকাব্দ—১৮৮২) ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হরিদাসকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্রপুরস্কার' প্রদান করে তাঁকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেন—বিশ্বকবির জন্ম-শতবর্ষপূর্ত্তিতে মহাকবির সম্মাননা। জোড়াসাঁকোর কবিতীর্থে পুরস্কারটি বিতরণ করবেন ভারতের সর্ব্বজনমান্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—

এই ছিল আয়োজন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে হরিদাস সে সভায় হাজির হতে পারেন নি। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যোগেশবাবুই পুরস্কারটি গ্রহণ করেছিলেন। তার আগে ১৩৬৭ সনেই (ইং ১৯৬১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী) কলকাতা মহানগরীর গুণগ্রাহী পৌরবৃন্দ ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র বসু (পৌরপ্রধান) বর্ণাঢ্য ভাষায় ও সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে হরিদাসকে বিজয়শ্রী-সংবর্ধনা জানিয়েছেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে হরিদাস সেদিন পৌরভবনে যেতে পারেন নি। 'পৌর কর্তৃপক্ষকে তাই বাধ্য হইয়াই তাঁহার একটি তৈলচিত্র সুসজ্জিত টেবিলের উপর রাখিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্দ্ধনানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হয়।'* সেখানেও হরিদাসের প্রতিনিধিত্ব করেন যোগেশবাবু। তারপর পৌর-প্রধান তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে 'ভক্তি-বিনম্রচিত্তের সহস্র প্রণাম' নিবেদন করেন এবং 'অনাময় সুকৃতি সমুজ্জ্বল শিবদ সুদীর্ঘ পরমায়ু" কামনা করেন।* হরিদাস তাঁর লিখিত যে আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেন—"আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ আমার বয়ঃকনিষ্ঠ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ব্যক্তিগতভাবে আপনারা সকলেই সুখী ও দীর্ঘজীবী হোন।"* "অসুস্থ মহাপণ্ডিতের মুখে মেয়র কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি শুধু মহাভারতের কথাই বলেন। মনে হয় জীবনের বাকী অংশটুকুও তিনি মহাভারতের ধ্যান করিয়াই কাটাইবেন॥"* কেন্দ্রীয় সরকার হরিদাসকে ১৩৬৮ সনে (ইং ১৯৬১ সালে) সংস্কৃতের জন্য 'অর্ডার অব মেরিট'-এ ভূষিত করেন এবং তাঁর জন্য বার্ষিক ১৫০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন।

কত সংস্থা ও পরিষদ যে সে সময় হরিদাসকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন তা লিখে শেষ করা যাবে না। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, ইণ্টালী এ্যাথ্‌লেটিক ক্লাব, তালতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বালিঘাই'-এর (মেদিনীপুর) রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, কোটালিপাড়ার অধিবাসীবৃন্দ, পাশ্চাত্য বৈদিক সঙ্ঘ ইত্যাদি সকল সংস্থা থেকে বিভিন্ন ভাষায়, বিচিত্র ছন্দে একই ধ্বনি উঠেছিল—'জয়ত্যসৌ শ্রীহরিদাস শর্ম্মা'; 'ভূলোক-দ্যুলোকে হোক শতমুখে তোমার বিজয় গান।'

॥ সাত ॥

শ্রদ্ধাপ্লুত দেশবাসী তখন ভাবতেও পারেন নি যে তাঁদের পরমাত্মীয়, আচার্য্য হরিদাসের মহাপ্রয়াণের লগ্ন আসন্ন। কিন্তু সে কথা পরে। এখন আমরা তাঁর 'বঙ্গীয় প্রতাপম্', 'মিবার প্রতাপম্' ও 'শিবাজীচরিতম্'-এর সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিতে পারি।

'বঙ্গীয় প্রতাপম্' ও 'মিবার প্রতাপম্' হ'ল নাটক ; আর 'শিবাজীচরিতম্' মহানাটক। পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি যে সংস্কৃত সাহিত্যে মহানাটকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সাহিত্যদর্পণকারের মতে মহানাটকের লক্ষণ হল—

> "২৫২। এতদেব যদা সর্ব্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম।
> অঙ্কৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমূচিরে ॥"

বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখলে, নাট্যকার হরিদাস সনাতনপন্থী। কিন্তু বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গণ্ডী ছেড়ে অনেক-দূর এগিয়ে এসেছেন। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের কারণও আছে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে স্বাধীন হবার আগেই বই তিনটি লেখা। হরিদাস দেশবাসীকে নূতন করে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে আসতে হয়েছে সাম্প্রতিক কালে আর নায়কত্বে বরণ করতে হয়েছে দেশবন্দিত বীরপুরুষদের। মহানাটকের নায়ক শিবাজী সম্পর্কে তিনি 'নিবেদনম্'-এ বলেছেন—"অথ কেচন বিদেশীয়া দেশীয়াশ্চ ইতিহাসলেখকাঃ প্রমাদাদ্বা রুচিবৈচিত্র্যাদ্বা শিবানন্দসিংহং দস্যুতয়া চিত্রয়ামাসুঃ ; নিরপেক্ষচিত্তাঃ প্রকৃতদর্শিনশ্চ বয়ং মহাপুরুষ বিষয়ে তাদৃশং চিত্রণং শ্মশানস্থমঙ্গারমিব পরিহৃতবন্তঃ।" তাঁর দেশ হ'ল সসাগরা ভারতবর্ষ, —দ্বিতীয়া পৃথিবী। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিশ্বজগৎ —'একং হি ভারতং মন্যে দ্বিতীয়াং পৃথিবীমিব।' তাঁর চোখে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের এবং বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নাঞ্জন। সেই গৌরবময় ভারতের 'জ্ঞান-স্বত্বের মর্মাধার' হল সংস্কৃত ভাষা। তাই সংস্কৃত-ভারতী আর ভারত সংস্কৃতির পুনরুভ্যুদয়ের আশা অপরূপ ভাষা পেয়েছে 'মিবার প্রতাপম্' এর সূত্রধারের মুখে—

“সংস্কৃত ভারতী ভারতসংস্কৃতিরুদয়তু
পুনরপি ভারতবর্ষে।
ভবনে ভবনে বদনে বদনে খেলতু সংস্কৃতভাষা
ময়ূরীসদৃশী বারিদবর্ষে ॥”

তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে একতাই শক্তি। শিবাজীর মুখে এ-কথা তিনি প্রচারও করেছেন ‘একতাশক্তির্হি সর্ব্বাভিভাবিনী’। আবার ‘শিবাজী চরিতম্’-এর মহেশ্বর শাস্ত্রীর মুখে ধ্বনিত হয়েছে হরিদাসেরই কথা—‘ভাষাণাম্ ভারতীয়ানাং মূলমেকং হি সংস্কৃতম্’। সুতরাং সংস্কৃতভাষার সাধারণসূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে একত্রে গ্রথিত করার পরিকল্পনাও হয়ত তাঁর ছিল।

ইতিহাসের ভাঁড়ার থেকেই মালমশলা যোগাড় করে হরিদাস তাঁর চরিত্রগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। ঘটনাবিন্যাসেও তিনি সাধারণতঃ ইতিহাসকে অতিক্রম করেন নি। কিন্তু নাট্যকলার ও অলঙ্কারশাস্ত্রের দাবীদাওয়া ত তাঁকে মানতে হয়েছে। ফলে এখানে সেখানে কিছু কিছু হেরফের যে হয় নি তাও নয়। নায়কের পরাজয় সংস্কৃত নাটকে স্থান পেতে পারে না। তাই ‘বঙ্গীয় প্রতপম্’ নাটকটি শেষ হয়েছে প্রতাপাদিত্যের জয়ধ্বনির মধ্যে। তারপরের কথাগুলি তিনি নাটকের শেষে ‘ইতিহাসপরিশেষ সংক্ষেপঃ’ নামে মাত্র চৌদ্দ পঙক্তির এক অনুচ্ছেদে অনবদ্য গদ্যে বলেছেন। অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।—

“ইতিহাস পরিশেষ সংক্ষেপঃ।

প্রতাপাদিত্যো মানসিংহেন সহ প্রথমদিন দ্বিতীয়দিনযুদ্ধয়োর্বিজয়বৈজয়ন্তীমলভত। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ এব চ বঙ্গীয় প্রতাপং নাটকং সমাপ্তিমাপ্তম্। তৃতীয় দিবসে ত সমরাঙ্গনস্যোত্তরস্যাং দিশি প্রতাপাদিত্যে যুধ্যমানে রাঘবরায়-মন্ত্রণয়া কূট-কৌশলী মানসিংহঃ সঙ্কুলযুদ্ধকালে অপরাহ্ণে সমরাঙ্গনস্য দক্ষিণস্যাং দিশি প্রতাপাদিত্যো নিহত ইতি সোল্লাসং মিথ্যা প্রচারয়ামাস। তেন চ তত্র জাতো বঙ্গীয় সেনায়াঃ সঙ্গভঙ্গঃ; যাবচ্চ তত্ সংহতিবিধানায় প্রতাপাদিত্যো দক্ষিণাং দিশাং ধাবিতঃ, তাবদুত্তরস্যামপি দিশি তথা মিথ্যা প্রচারাৎ তত্রাপি তাদৃগেব বঙ্গবাহিন্যাং বিশৃঙ্খলতা সমজনি। অনয়া চ বিশৃঙ্খলয়া হতাশতয়া চ বহব এব সেনাপতয়ো নিহতাঃ; প্রতাপাদিত্যশ্চ বন্দীকৃতঃ, বিধ্বংসিতা চ ধূমঘাটনগরী। ক্রমেণ চ প্রতাপাদিত্যো লৌহপিঞ্জরে নিধায় গজপৃষ্ঠেন নীয়মানো বারাণসীং যাবদ্‌গত এব পঞ্চত্বং গত ইতি।”

তিনটিই বীররসের ও দেশাত্মবোধের নাটক। কাজেই বিদূষক যে এখানে

নসই হবে না সে কথা নাট্যকার বুঝেছিলেন। কিন্তু হালকা হাসির দমকা য়ায় মনের চাপা উত্তেজনায় মেঘে কেটে যায়। কাজেই তারও প্রয়োজন ছ বৈকি। তাই মাঝে মাঝে সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ র প্রতাপম্'-এর চতুর্থ অঙ্ক থেকে অংশবিশেষ তুলে দিলাম—

“তৃতীয়ঃ। পুত্রবান ভব।
সর্ব্বে। (হসন্তি।)
শান্তি। (সহাসম্) অয়ে। স্ত্রী খল্বেষা। তদ্বতীতি ব্রূহি।
তৃতীয়ঃ। (শিরঃ সঞ্চাল্য) সত্যম্, পুত্রবানবতী ভব।
সর্ব্বে। (অট্টহাস্তং কুর্ব্বন্তি।)
শান্তি। অহো! পুত্রাৎ পরং বানিতি ন তিষ্ঠেৎ।
তৃতীয়ঃ। (সশিরঃ কম্পম্) বাঢ়ম্, বানপুত্রবতী ভব।
সর্ব্বে। (তথৈব হসন্তি!)
শান্তি। আঃ। পুত্রাৎ পূর্ব্বমপি বানিতি ন ভবেৎ।
তৃতীয়ঃ। তর্হি পুত্রবতীবান্ ভব ?
সর্ব্বে। (হসন্তি।)
শান্তি। (সহাসম্) এতদপি ন।
তৃতীয়ঃ। বতীপুত্রবান্ ভব।
শান্তি। আঃ! কোহয়ং দুর্ব্বিপাকঃ।
তৃতীয়ঃ। তদা বান্‌বতীপুত্র ভব।
শান্তি। নৈবমপি।
তৃতীয়। অস্তু, তর্হি বতীবান্ পুত্র ভব।
শান্তি। ধিঙ্, মূর্খ!।
তৃতীয়। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রদর্শ্য) তদা তু নাস্তেব সংস্কৃতভাষায়ামীদৃশীনা-
র্ব্বাদঃ।”

ব্রাহ্মণের ভাষা ও ব্যাকরণ জ্ঞানের বহর দেখে না হেসে আর পার নেই। শষ করে উদ্ধৃতিটির শেষে ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্তটি বড়ই উপভোগ্য।

গানগুলি বই তিনটির বিশেষ আকর্ষণ। এত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কৃতে রচনা করা হরিদাসের পক্ষেই সম্ভব। বেছে বেছে পাঁচটি নীচে তুলে াম। পড়ে নিশ্চয়ই সকলে আনন্দ পাবেন। গুণীজনেরা স্বরারোপ করেও তে পারেন।

(ক)

হে সন্তান !　　　　　　　　তব জননী ।
ধনজনসমন্বিতা　　　　　　　কেন অনাথিনী ।
পরমুখে দৃষ্টিকরী　　　　　　পরদ্বারে ভিক্ষাকরী ।
যথাদীনহীন নারী　　　　　　জীবিতা বিষাদিনী ॥
অতিনিদ্রাপরায়ণ—　　　　　নিরুদ্যমপুত্রগণ .
আলস্য বশজীবন　　　　　　আকুলা গৌরবিনী ॥

(বঙ্গীয় প্রতাপ, পৃঃ

(খ)

অরে !　আকাশে বহতি বাতঃ, ভাসতে মেঘঃ, দৃশ্যতে ভঙ্গঃ ।
তূর্নং তূর্নং বাহয় বাহয়, সকলা নৌকোঃ ।
তোলয় জালং　　　　　　　চালয় পারং
ন ক্ষিপ কালং জীর্ণা নৌকাঃ ।
প্রাপ্তো ন মত্‌সঃ　　　　　　রোদিতি বত্‌সঃ
অন্তিকে কচ্ছঃ, দূরে গৃহাঃ ॥

(জেলের গান, বঙ্গীয় প্রতাপ, পৃঃ ৬

(গ)

কলকলকারি জাহ্নবীবারি বহতি নদতি জটাজালে ।
হিমগিরিকন্যা ভুবনশরণ্যা মিলতি বপুষি বিশালে ।
অতিমনোহরো বালনিশাকরো বিকসতি বিলসতি ভালে ।
নাশয় বিপদং দেহি হৃদি পদং শঙ্কর !　মম চিরকালে ॥

(বঙ্গীয় প্রতাপ, পৃঃ ৭

(ঘ)

কান্তিমন্তি বৃন্তধন্তি হস্ত সন্তি কাননে
প্রসূনানি সুরভীনি লোভনানি শোভনে ।
সুরসিকমধুকরো গুনগুন গান করো
বিচরতি রসহরো মলয়বায়ু কম্পনে ।
চলতি মঞ্জুমঞ্জরী পরিসরতি মাধুরী
গায়তি কোকিলাকিন্নরী মানবমনমোহনে ॥

(শিবাজীচরিত, পৃঃ ২৬

(ঙ)

ধাব ধাব বীর ! তুমুলরণ মধ্যে
সংহর সততং নহি দয়া বধ্যে।
শীঘ্রং প্রহর প্রহরণশালী
বদনে বদতাং জয় মা কালি !
ভিন্ধি ভিন্ধি ত্বরিতং রিপুবক্ষঃ,
ছিন্দি ছিন্ধি দ্বিষতো ননু দক্ষ !
বিপদি নিমগ্না জননী চ জায়া
কা তব শান্তিঃ কা তব মায়া।
দ্বিষতামসৃকা সংসৃজ সিন্ধুম্
উদ্ধর বিষয়াদুদ্ধর বন্ধুম্।
নাশয় নিবিড়ং তিমিরং তূর্নং
চিরমালোকং কুরু পরিপূর্ণম্ ॥

(মিবার প্রতাপ, পৃঃ ৫৫)

হরিদাস ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সুকৌশলেই সুবিধামত সাজিয়ে নিয়েছেন। বইগুলিতে নাটকীয় মুহূর্ত্ত, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা কোনো কিছুরই অভাব নেই। মুখে শাস্ত্র থেকে হরিদাস নীতিকথা উদ্ধার করতে ভোলেন নি। আবার নাহীন রণক্ষেত্রের কথাচিত্রগুলিও উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। তাছাড়া বহু সারাল ও উক্তিতে সমৃদ্ধ এই নাটকগুলি। হরিদাসের কবিসত্তা অবশ্য মাঝে মাঝে ছন্ন করে ফেলেছে নাট্যকারকে। ফলে নাটকের গতি কোনো কোনো সময়ে মিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে করে আমরা অনেক দুর্লভ কাব্যকণিকাও পেয়েছি। দের মধ্যে একটি এখানে দেওয়া হ'ল—

"স্নিগ্ধা মৃদুস্পর্শসুখা মনোরমা
নিস্নেহরুক্ষা তু মনোরমৈব ন।
মনঃ সমাকর্ষতি বল্লি বল্লরী
শাখা নবীনাপি তু নো বিজানতঃ ॥১০॥"

(মিবার প্রতাপ, পৃঃ ৯৮)

শ্রীমতী উষা সত্যব্রত হরিদাসের নাটকগুলির বিস্তারিত ও বিদগ্ধ সমালোচনা ছেন তাঁর 'বিংশশতাব্দীর সংস্কৃত নাটক' নামের বইটিতে। বইটি পড়ে আমি

যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। শ্রীমতী সত্যব্রত মুখবন্ধে বলেছেন—"বস্তুনিষ্ঠ রসপণ্ডি দের আনন্দ দেবার মত যথেষ্ট উপাদান আছে আধুনিক সংস্কৃত সাহি ব্যাপ্তিতে, সারবত্তায় ও উপস্থাপনায়, ইহা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কণিকাগুলির স অনায়াসে এক পর্য্যায়েই স্থান পেতে পারে।"† পরে হরিদাসের নাটকগু সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"একটি নাটকে গ্রন্থকার (হরিদাস) নিজে 'মহাকবিপ্রাপ্যযশোঽভিলাষী' অর্থাৎ 'মহাকবির প্রাপ্য যশকামী' বলে ব করেছেন। সত্যিই আনন্দের কথা যে তাঁর সে বাসনা সর্ব্বাংশেই পরিপূর্ণ হ ছিল। গ্রন্থকার নিঃসংশয়ে বিংশ শতাব্দীর একজন মহাকবি (শ্রেষ্ঠ কবি)।"

উদ্ধৃতি দুটি পাশাপাশি রেখে পড়লে এ সিদ্ধান্ত সঙ্গতভাবেই মনে আসে হরিদাসের কাব্য ও নাটক সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তির গোষ্ঠীভুক্ত।

॥ আট ॥

শাস্ত্রজ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও প্রতিভার প্রাখর্য্য হরিদাসকে ঘিরে যেন এক দু বেষ্টনী রচনা করে রেখেছিল। সে বেষ্টনীকে ভেদ করে হরিদাসের ব্যক্তিস নাগাল পাওয়া অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমি ছেলেদের (বিশেষ করে যোগেশবাবুর) ও তাঁর নাতনী শ্রীমতী আরতি গু সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে পত্রমারফৎ যোগাযোগ করার চে করেছি। ফলে যা জেনেছি তাই আপনাদের বলছি।

হরিদাসের মাত্র দু'জন ছাত্রের (সর্ব্বশ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মৌলিক, কাব্য-সাং বেদান্ততীর্থ; সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ) সঙ্গে যোগা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা দুজনেই আজ বয়সের ভারে অবনত। তবু গুরু সম্পর্কে যা তাঁদের মনে আছে, তা তাঁরা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখে আমা জানিয়েছেন।

---

† Sanakrit dramas of Twentieth Century—by US SATYAVRAT, M.A., Ph. D. (মূল ইংরেজী পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল

* যোগেশচন্দ্রের কন্যা; পাশ্চাত্য বৈদিক মহিলাদের মধ্যে প্রথম অধ্যাপি এখন মৌলানা আজাদ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। বহু বিতর্ক স ইনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধও লিখেছেন নয়।

হরিদাসের শখ-সাবুদের মধ্যে দাবাখেলার কথাই আমাদের সবার আগে মনে পড়ে। শৈলেনবাবু তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—"(নকীপুরে অবস্থানকালে) একবার এক দারোগাবাবু থানায় আসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে খুব সদ্ভাব হইয়াছিল তিনি দাবা খেলিতেন তাঁর অতি বড় প্রিয় টীকাদি লেখার মধ্যে। দু'একদিন সায়ংসন্ধ্যার পর বসিয়া রাত্রি শেষ করিয়াছেন।…" সুরেনবাবুও লিখেছেন—"মাঝে মাঝে দাবা খেলার জন্য গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা তাঁহার সাধনার একটু ব্যাঘাত ঘটিত বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। গ্রামের খেলোয়াড়গণ একদিকে এবং তিনি একক অন্যদিকে। যখন তিনি এই খেলায় বসিতেন তখন তাঁহার দিকে তাকাইলে মনে হইত কোনও সাধক যেন তাঁহার উপাস্য দেবতার উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। এই খেলা বেলা ৪টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮-৩০টা ৯টা পর্য্যন্ত চলিত। ফলাফলে শুনিতাম তিনিই বিজয়ী!"

তিনি পাখোয়াজ, ঢোল, তবলা ও হারমোনিয়াম বাজাতেও পারতেন। নিজেই তিনি ডঃ সুশীল রায়কে বলেছেন—"এ সময় আমার কয়েকটা শখ ছিল। পাখোয়াজ, ঢোল তবলা ও হারমোনিয়াম বাজাতে পারতাম। সে অভ্যাস এখন অবশ্য আর নেই।"—(মনীষী জীবনকথা ২১)।* যখনকার কথা হরিদাস বলেছেন তখন তিনি কোটালিপাড়া আর্য্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই প্রবন্ধে ডঃ রায় আরও বলেছেন—"এই সময় শিল্পকার্য্যেও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজ বাটীর দুর্গামণ্ডপ নিজে তৈরী করে নিজ হাতেই টালী তৈরী করে সেই মণ্ডপ ছেয়েছিলেন।"* এইসব বাজনা বা কাজ হরিদাস কবে কোথায় শিখেছিলেন তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তবে যোগেশবাবু বলেন যে যখন তিনি রাগসঙ্গীত নিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ করে দিতেন তখন মনে হত জীবনভোর তিনি যেন গানবাজনার চর্চ্চাই করে চলেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারেও তাঁর দারুণ উৎসাহ ছিল। 'মিবার প্রতাপম্'-এর অভিনয়ের সময় তিনি বাড়ীর অনেককেই পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আরতি-ইন্দিরা, ভবেশচন্দ্র (আরতির কাকা)—ইন্দিরার দাদা; সব থেকে ভাল অভিনয় করেছিল টুকুন (ধীরেশ, যোগেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে)। একটা কথা, এ আলোচনায়, পরিষ্কার বোঝা গেল যে হরিদাস কোনকিছুই হালকাভাবে নিতেন না—সে তা খেলাধুলোই হোক, বা শখ-সাবুদই হোক।

নেশার মধ্যে ছিল তাঁর এক তামাক খাওয়া। সুরেনবাবু লিখেছেন—"তিনি

অবিশ্রান্তভাবে রাত্রি ১১টা সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত অনর্গল শাস্ত্রালোচনায় কাটাইতেন। পাঠদানের পরিশ্রম লাঘবের জন্য মাঝে মাঝে এক এক কলিকা গুড়ুক তামাক খাইতেন। ইহা ছাড়া আমি তাঁহাকে অন্য নেশা করিতে দেখি নাই।" জীবনের শেষ রাতেও তিনি বেশ মৌজ করেই তামাক খেয়েছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রতাপম্'-এ তামাকের গুণাগুণ এক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে তিনি বেশ রসিয়েই বলেছেন—

"নারীনাং গুড়িকা বিখণ্ডিতদলং দোক্তা চ সক্তা পৃথক্
নস্যং ভূরিমনীষিণাঞ্চ চুরটং চঞ্চদ্বিলাসাত্মনাম্।
হুক্কা-গুড়্গুড়িকাল্বলা-বিনসনৈঃ শেষান্ সমালম্বতে
চক্রং দর্শয়তে চ্যুতং বিতনুতে মুক্তিং প্রদত্তে পরম্ ॥৬॥"

(বঙ্গীয়প্রতাপ—পৃঃ ১০০)

শ্লোকটি পড়লে ঈশ্বরগুপ্তের জনপ্রিয় কবিতাটির কথা মনে পড়ে না কি ?

সুরেনবাবুর চোখে হরিদাস যেন সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ বিশ্বকর্ম্মা। তিনি লিখেছেন—"স্বরচিত পুস্তকাদি ছাপানর জন্য বার বার কলিকাতায় যাতায়াতের বেগ ও অযথা ব্যয়ভার বহন করিয়া তিনি যখন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার একটি প্রেস করিবার প্রবল ইচ্ছা হয় এবং অদম্য চেষ্টায় কলিকাতা হইতে একটী হ্যাণ্ড-প্রেস ও উহার আবশ্যকীয় সরঞ্জামসহ একজন বিহারী কম্পোজিটারকে সঙ্গে লইয়া নকীপুরে আসিয়া সেখানকার কয়েকজনকে কম্পোজ শিক্ষা করাইয়া মাসখানেকের মধ্যে যথানিয়মে প্রেস চালু করার জন্য ১ জন প্রিণ্টার ৪ জন কম্পোজিটার ১ জন ইঙ্কম্যান এবং ১ জন জমাদার এই সাতজন কর্ম্মচারীকে সারাদিন কর্ম্মতৎপর রাখিয়া নিজের সাধনা অব্যাহতভাবে চালাইয়া ছাত্রগণের অধ্যাপনা যথারীতি সম্পন্ন করিয়া ঘড়ির কাঁটার মত সবদিককার তাল সমান রাখিয়া তিনি যখন কৃতকার্য্য হইলেন তখন তাঁহার উৎসাহ যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাকে তখন যেন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার মতই মনে হইত।…ঠিক এই সময়ে বাংলা, বিহার, ভারতের সর্ব্বত্র এমন কি সুদূর লণ্ডন পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত পুস্তকের অর্ডার বহুল-পরিমাণে আসিতে থাকায় তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।" অনধ্যায়ের দিন তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসে খেলাচ্ছলে সংস্কৃতে সমস্যাপূরণ করা শেখাতেন। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা তাঁর ছাত্রদের কাছে রীতিমত প্রাণান্তকর বলেই মনে হত। ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে মাঝে মাঝে প্রশ্নগণনার পরীক্ষা দিতে হত স্থানীয় হেডমাষ্টার মশাই'এর কাছে। শৈলেনবাবু লিখেছেন—"তিনি (হেডমাষ্টার) মাঝে মাঝে গুরুদেবের লেখায় বিঘ্ন ঘটাইয়া

কৌতুক করিতেন। হাতের মুঠায় একটি কিছু লইয়া বা না লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় উঠানে দাঁড়াইয়া বলিতেন—'বলুন আমার হাতে কি আছে?' দেশের লোক, হেডমাষ্টার। গুরুদেব লেখা রাখিয়া তখন গণনা দ্বারা বলিয়া দিতেন। একদিন একটি মুসুরী ডাল, একদিন শশা, একদিন একটি পাতাসহ ফুল একদিন রিক্ত মুঠাদ্বারা তিনি যখন জানিলেন গণনা অব্যর্থ তখন গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'তাহলে আর বৃথা আমার লেখার সময় বিঘ্ন ঘটাইবেন না।"

হরিদাস যখন মহাভারতের কাজ আরম্ভ করেন তখন হেমচন্দ্রের বয়স হবে বছর কুড়ি, আর যোগেশচন্দ্রের বছর ষোল। তখন তাঁরা দূর থেকেই কর্ম্মনিমগ্ন বাবাকে দেখেছেন। দুনিয়ার খবর জানতে হ'লে তিনি অবশ্য যোগেশচন্দ্রকেই ডেকে পাঠাতেন—একমাত্র তিনিই তখন ইংরেজী কেতায় পড়ে চলেছেন। পরে আরতি একটু বড় হলে, তিনিই দাদুকে রোজ খবরের কাগজ আগাগোড়া পড়ে শোনাতেন। আরতি তখন ছেলেমানুষ: এ কাজ তাঁর ভাল লাগবে কেন? তিনি পুরানো দিনের কথা তুলে বললেন—"দাদুকে দেখাশোনা করত দুটি লোক—তারাপদ ও সরি (সরস্বতী)। সন্ধ্যের পর দাদু বিশ্রাম করতেন, আর তারাপদ ও সরি দাদুর গা-হাত-পা টিপে দিত। সেই সময় পড়ত আমার ডাক। খবরের কাগজটা তাঁকে আদ্যোপ্রান্ত পড়ে শোনাতে হত। মাঝে মাঝে আমি ফাঁকি দেবার তাল করতুম, কিন্তু পেরে উঠিনি। আখেরে অবশ্য লাভ আমার কম হয় নি—উচ্চারণের দোষত্রুটি শুধরে গেছে এবং দেশবিদেশের অনেক কথাই অল্পবয়সে জেনেছি। দাদুকে তখন আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি, পরে বাবা সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।" দাদুর জ্ঞানস্পৃহার কথায় তিনি বার বার ফিরে এসে আমাকে বলেছেন—"দাদুর জানার ইচ্ছে ছিল অশেষ। পাগলের মত তিনি পড়তে ভালবাসতেন। বাবার ও আমার কাছে মন দিয়ে শুনতেন দেশ-বিদেশের ইতিহাস। কথা অবশ্য তিনি বড় একটা বলতেন না, মতামত ত দিতেনই না। আমি একবার লেখকের নাম না বলে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প পড়ে শুনিয়েছিলাম। গল্পটি তিনি যে আগে একবার শুনেছিলেন তা আমার খেয়াল ছিল না। ধরা পড়ে মানতেই হ'ল যে গল্পটি রবীন্দ্রনাথের।"

হরিদাসের জীবনযাপনরীতির মোটামুটি একটা ছক এখন আমরা পেয়ে গেছি। এরপর স্বভাবতই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে যে তিনি কি রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, না মজলিশি লোক ছিলেন? আরতি যেন একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন—"দাদুকে বরং রাশভারী বলাই চলে। পরিবারের

কর্ত্তা ; বয়সে সবার বড়—কাউকে কখনও প্রণাম করতে দেখিনি। মহাভারত লেখার সময় কোনোদিকে ফিরেও তাকান নি। এমন পড়া-পাগল লোকও দেখা যায় না। যে যতটা লেখাপড়ায় ভাল, দাদু যেন হিসেব করে তাকে ততটাই ভাল বাসতেন। আবার নিষ্ঠাবান বলে বাচ্চুকেও (বীরেশ—যোগেশবাবুর তৃতীয় পুত্র) বেজায় ভালবাসতেন। দাদু নিজে যেচে আমাদের সঙ্গে মোটেই হাসি-ঠাট্টা করতেন না। আমরাই অনেক সময় চেষ্টা করে তাঁকে আমাদের হাসিগল্পের আসরে টেনে আনতাম।" যোগেশবাবু অবশ্য বলেছেন যে মেজাজ ভাল থাকলে তিনি বেশ জমিয়েই গল্পগুজব করতেন। বাবার বলা একটি গল্পও তিনি বলে গেলেন—"দুই পণ্ডিতের কোনো এক বাড়ীতে দেখা হল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ নিজেকে পণ্ডিত ও বৃত্তিতে শিক্ষক বলে পরিচয় দিলেন। সকালে দু'জন পণ্ডিত শুনলেন যে পাশের ঘর থেকে ব্রাহ্মণ বেশ উঁচু গলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাচ্ছেন—কিন্তু 'জগদ্ধিতায়' কথাটির জায়গায় বলছেন—'জগদ্‌ঢিপায়'। তাঁরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, কিন্তু শোনার ভুল মনে করে চেপে গেলেন। সন্ধ্যায় আবার সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। তখন আর না থাকতে পেরে তাঁরা ব্রাহ্মণকে বললেন—'ঠাকুরমশায় 'জগদ্‌ঢিপায়' বলে কোনো কথা হয় না। আসল কথাটি হ'ল 'জগদ্ধিতায়'।' এবার ব্রাহ্মণের অবাক হবার পালা। তিনি 'জগদ্ধিতায়' কথাটার মানে জানতে চাইলেন। মানে শুনে তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—'মশায়, জগতের হিত ত সামান্য একটা পিঁপড়েও করতে পারে। কৃষ্ণ জগতের হিত করে নতুন বা অদ্ভুত কর্ম্ম একটা কি করলেন যার জন্যে তাঁকে প্রণাম জানাতে হবে?' পণ্ডিতদের তখন স-সে-মি-রা গোছের অবস্থা। একজন শুধু জানতে চাইলেন 'জগদ্‌ঢিপায়' কথাটির মানে। ব্রাহ্মণ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললেন—'এ জগতে অন্যায় করলে আর রক্ষে নেই। কৃষ্ণ স্বয়ং ঢিপ ঢিপ করে কিলিয়ে অন্যায়কারীকে দুরস্ত করে দেবেন। তিনিই জগতের শাসনকর্ত্তা কিনা।' একথা শুনে পণ্ডিতেরা রণে ভঙ্গ দিলেন। কিন্তু গল্পটা এখনও শেষ হয় নি। রাতে একজন পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলেন—'শুষ্ক পাণ্ডিত্যে কি ফল? ব্রাহ্মণ যদি আমাকে জগতের শাসনকর্ত্তা ভেবেই ভক্তিভরে প্রণাম করে, তাতে তোমাদের কি এসে যায়? যাও, ব্রাহ্মণকে বলে দাও, যেন সে আগের মত আমাকে 'জগদ্‌ঢিপায়' বলেই প্রণাম জানায়।' ভীত ও অভিভূত পণ্ডিত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে গলবস্ত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করলেন—'ঠাকুর, আপনার ব্যাখ্যাই ঠিক। আমাদের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।' নিখিলবঙ্গ পাশ্চাত্য বৈদিক

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সভাপতি হিসেবে তাঁর গুরুগম্ভীর ভাষণেও প্রতিপক্ষকে পরিহাস করে বলেছিলেন—"যদি অন্যভাষার ধাতুর পরে অন্য ভাষার ব্যাকরণের প্রত্যয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'আই গো' এই বাক্যের 'গো' ধাতুর উত্তরে সংস্কৃত ভাষার 'তি, তস্, অন্তি' ইত্যাদি প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া 'গোতি, গোতঃ, গোন্তি' ইত্যাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি ?" নাটকগুলিতেও তাঁর সরস মনের স্পর্শ আছে। অন্যপ্রসঙ্গে আমরা তা আলোচনা করেছি। এখানে একজন ব্রাহ্মণের মুখে 'শ্যামাবর্ণনম্' শুনুন—

"দেবীসম্বাং স্থতানাং ক্ষিতিধর বদনাং ভ্রাষ্ট্রকন্তিং জঘন্যাং
খট্টারূঢ়ামুদারামরুণিত নয়নাং সর্ব্বদা বগ্‌বগন্তীম্।"

ইত্যাদি—

(বঙ্গীয় প্রতাপ, পৃঃ ১০৩)

কিন্তু যখন তিনি মহাভারতের সাধনায় নিমগ্ন তখন তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বসে হাসি গল্প করার সময় কোথায় ? তখন হরিদাস নিজেকে সাধারণ আনন্দ-বেদনার জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছিলেন। নাতি-নাতনীদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন অনেক দূরে, যেখানে ছেলের সাঙ্ঘাতিক অসুখের খবরও ঠিকমত গিয়ে পৌঁছোত না। সে ছেলে,—যোগেশচন্দ্র। তিনি আমাকে বলেছেন—"যেদিন ডাক্তারবাবু একেবারে রায় দিয়ে গেলেন, সেদিন বাবা একবার এসেছিলেন। তারপর নতুন করে কোষ্ঠী বিচার করালেন। বিচার করে তাঁর ছাত্র কৃতীজ্যোতিষী শ্যামাকান্ত স্মৃতিতীর্থ, স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে আমার প্রাণ-হানির কোনো আশঙ্কা নেই। এমন কি কোন তারিখ থেকে রোগের দাপট কমবে তাও বলে দিলেন। আমরা সময়মত খেয়াল করে দেখেছি যে তাঁর গণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।" এটি দুশ্চর ব্রতধারীর অসামান্য ধৈর্য্যের ও শাস্ত্রবিশ্বাসের কাহিনী, স্নেহহীনতার প্রামাণ্য দলিল নয়।

অন্তর্স্বভাব কোমল না হলে কেউ কি কবি হতে পারে ? ব্যক্তিগত জীবনে হরিদাসকে স্নেহে বা শোকে উচ্ছ্বসিত বা বিচলিত হতে হয়ত কেউ দেখেন নি। সেটা তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফল, হৃদয়হীনতার প্রমাণ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী সরলাসুন্দরীর স্মৃতি আজীবন যত্নে লালন করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী কুসুমকামিনীর শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁর মত ধীর, স্থির মানুষও শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রাখতে পারেন নি—তাও আমরা জানি। ছাত্রেরা তাঁকে 'শিষ্যবৎসল' বলেই বিশেষিত করেন। ছেলেবেলাকার পড়ার ও খেলার সাথীদেরও

তিনি ভোলেন নি। ঘটনাপঞ্জীতে তাঁদের কথাও যত্ন করেই লিখে রেখেছেন—"...ব্রজ- কুমার মহাশয়ের টোলে সতীর্থগণের মধ্যে বাল্মীর গুরুচরণ বিদ্যাভূষণের পুত্র অন্নদার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।"..."ঐ টোলে (সিদ্ধান্ত পঞ্চাননের) হুয়াইর নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত সতীর্থগণের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।" পাণ্ডুলিপির একটি জাবদা খাতায় তিনি একজায়গায় লিখে রেখেছেন--'শ্রীঅন্নদাচরণ নামকমিত্রমত্র'। জ্ঞাতি ভাই লক্ষ্মীদাদার কথাও বার বার লিখেছেন। স্যার দেবপ্রসাদের সহিত তাঁর সার্থক সখ্যতার কথাও আজ সবাই জানে। জীবনের শেষ ভাগে তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন রাজেন ডাক্তার। রাজেনবাবুকে ভাল-মন্দ সব কিছু না বলতে পারলে তিনি শান্তি পেতেন না। আরতিও বলেছেন —"দাদু ছিলেন চাপা প্রকৃতির মানুষ। তবে মাকে সুলক্ষণা বলে মনে করতেন ও ভীষণ স্নেহ করতেন। বোধহয় মা আমাদের ঘরে আসার পরই তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়েছিলেন বলে—দাদুর অবশ্য স্নেহের বা শোকের প্রকাশ বড় একটা ছিল না। আমি একদিনই তাঁকে কাতর হতে দেখেছি। আমার এক ভাই আশুমণি মাত্র ছমাস বয়সে মারা যায়। দাদু সেদিন একেবারে অসহায় ভাবে মাকে সান্ত্বনা দেবার কত না চেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু বুঝতে আর কারুর বাকী ছিল না যে তিনি মুখে যা বলছেন, মনে মনে নিজেই তা মেনে নিতে পারছেন না।" এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও সংবাদের আড়াল থেকে একটি কোমল ও সংবেদনশীল মনের মানুষই উঁকিঝুঁকি মারে না কি? অনেক শোক তাপই তিনি পেয়েছিলেন এবং বিচিত্র ঘটনার তরঙ্গও আঘাত করেছে তাঁর জীবনের তটভূমিতে। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে বিকল ত দূরের কথা বিশেষ বিচলিতও করতে পারেনি। পারলে যে কি মহাসর্বনাশ হত তা ভাবতেও পারা যায় না। ধৈর্য্য ও সংযমের অক্ষয় কবচ পরেই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। তা ছাড়া মহাভারতের সঙ্গে তাঁর কোনকালেই বিচ্ছেদ হয় নি -জীবনের পূর্ব্বভাগে তিনি বার বার পাঠ করেছেন মহাভারত আর উত্তর ভাগে মহাভারতই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাই মনে হয় যে মহাভারতের মহর্ষির বাণীই শান্তচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন—

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্ত মরণান্তং চ জীবিতম্॥"

(স্ত্রীপর্ব্ব)

কৌলিক ধারা অনুযায়ী তিনি শাক্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি শৈব।

তাঁর বইগুলির মঙ্গলাচরণের সব শ্লোকই 'শঙ্করের' উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তবে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এই সব ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার নিয়ে তাঁর গোঁড়ামি বলতেও কিছু ছিল না। তিনি ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করতেন এবং শাস্ত্রের অনুশাসনও যথাসম্ভব মেনে চলতেন। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের সম্পর্ক তিনি বড় একটা স্বীকার করতেন না। যে দেশে যা সহজে পাওয়া যায় না এবং যা খেলে সহ্য হয় তাই খাওয়া উচিত—এই ছিল তাঁর মত। তবে অতি ভোজনের রেওয়াজ বাড়ীতে থাকলেও তাঁর খাওয়া ছিল নিয়মিত ও পরিমিত। পুজোর ব্যাপারেও তিনি উপকরণ বা আচারের খুঁটিনাটি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামতেন না—একথা আমরা আরতির মুখেই শুনেছি।

তাঁর দারিদ্র্য, ঋণমুক্তি ও ঋণাতঙ্কের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি হিসেব করেই চলেছেন। আবার শেষ জীবনে তিনি দানখয়রাতও করেছেন।

সংস্কৃতভারতী ও ভারতসংস্কৃতির পুনরুভ্যুদয়ের স্বপ্ন দিয়েই ঘেরা ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার মানসপট। কিন্তু উদাসীন তিনি, এ সব ব্যাপারে, আদৌ ছিলেন না। দৈনিক খবরের কাগজটি আগাগোড়া শুনতেন, দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে খোলামনেই আলাপ-আলোচনা করতেন এবং ছেলে ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে কথাচ্ছলে দুনিয়ার ইতিহাস ও জ্ঞানী-গুণীদের খবর নিতেন। কিন্তু কোনো বিষয়েই তিনি তর্ক করতেন না। আরতি এ সম্পর্কে বলেছেন—"আমাদের বাড়ীতে তখন রাজনীতির আলোচনার ঝড় বয়ে যেত। দাঙ্গা, স্বাধীনতা, মহাত্মাজী, পণ্ডিতজী, নেতাজী ও অন্যান্য মহান নেতাদের কথা সবই দাদু মন দিয়ে শুনতেন। কিন্তু কোনো তর্ক তিনি করতেন না।"

এরপর স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে হরিদাস ব্যক্তিগত জীবনে রক্ষণশীল না প্রগতিশীল ছিলেন। প্রশ্নটির সরাসরি কোনো উত্তর সম্ভব নয়, আর কেউ তা প্রত্যাশাও করেন না। হরিদাসের মানস সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বরং আমরা এ বিষয়ে একটু আলোচনা করতে পারি। হরিদাস যে ঐতিহ্যধারায় অভিষিক্ত, তাতে তাঁর পক্ষে রক্ষণশীল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংস্কৃতভারতী, ভারতসংস্কৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের পুনরুজ্জীবনই ছিল তাঁর জীবনবেদের মূল সূক্ত। তাঁর প্রথম দুই ছেলে শশিশেখর ও হেমচন্দ্র প্রাচ্যরীতিতে শিক্ষিত ও বিভিন্নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শশিশেখর অবশ্য কিছুটা ইংরেজীও পড়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হ'ল টোলে বা চতুষ্পাঠীতে নয়—পাশ্চাত্ত্য প্রথায় স্কুলে।

স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হিসেবে নাম করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার শানে পড়ে তাঁর সহজাত ও বংশগত বাগ্‌নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণশক্তি তীক্ষ্ণতর হল। তাই স্কুলজীবনেই তিনি বিভিন্ন সভায় কৃতিত্বের সঙ্গে বক্তৃতা করতে শুরু করেন। তারপর যখন তাঁর পরিচয় হল ইংরেজী তথা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে, যখন তাঁর সামনে জ্ঞান, আনন্দ ও চিন্তার নতুন এক দিগন্ত খুলে গেল। ধীরে ধীরে তিনি হরিদাসের প্রভাবপরিধি থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। তাঁরই মাধ্যমে হরিদাসের অন্তঃপুরে এল নতুন জীবনচর্য্যার ছাঁদ—খানাপিনায় নয়, চিন্তার স্বাধীনতায়। হরিদাস দেখতে পেলেন যে তাঁর ছেলে এখন নতুন ধ্যান-ধারণার পূজারী ; সে তাঁর নিজের বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করেই পথ চলার পক্ষপাতী। তিনি বুঝলেন যে মনু, পরাশর বা রঘুনন্দনের অনুশাসন আর সহজে রেখাপাত করবে না যোগেশের মনে, আর বদলাতেও পারবে না তার জীবনযাপনরীতি।

হরিদাস তাঁর পরিশীলিত ও যুক্তিনিষ্ঠ মন দিয়ে সমস্তটি নিশ্চয়ই আগাগোড়া বিচার করেও দেখেছিলেন। পাশ্চাত্য-বিদ্যাধুরন্ধর দেবপ্রসাদের জ্ঞানময় ব্যক্তিত্ব ও সহৃদতা তাঁকে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। তারপর তখন দেশের অনেক সুসন্তানই তাঁর কাছে আসতেন—ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রাধাবিনোদ পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, কাশীমবাজার ও সুসং-এর মহারাজারা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, বাণী রায়, উমা রায় ইত্যাদি। সেদিন জ্ঞানবৃদ্ধ হরিদাসের দেব লেনের বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল যেন জ্ঞানী ও গুণীজনের এক মিলনতীর্থ। হরিদাস এইসব দিক্‌পাল মনীষীদের মধ্যে বিদ্যা ও বিনয়ের সমন্বয় দেখে নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছিলেন। আর লক্ষ্যও করেছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে যোগেশের স্নিগ্ধ সম্পর্ক। বাঙ্গলার ইয়ুথলীগের সভাপতির ভূমিকায় যোগেশের সাংগঠনিক কুশলতার কথাও তিনি জানতেন। তিনি এ কথাও বুঝতে ভুল করেন নি যে 'ইংরেজী ভাষার প্রাচুর্য্য, আদর ও গৌরবের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতভাষা চালাইয়া উদ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হওয়া দুষ্কর।' তাছাড়া যোগেশের চিন্তাস্বাধীনতার বা জীবনযাপনরীতির মধ্যে অন্যের স্বাধীন ইচ্ছের ওপর গদাঘোরানোর মানসিকতা ছিল না—দুর্নীতি বা অ-নীতির 'স্থূলহস্তাবলেপ' ত

ছিলই না। তাই বলেই হয়ত যোগেশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করার তিনি দরকার মনে করেন নি। ফলে কিন্তু দেব লেনের বাড়ীতে হরিদাসের পরে আর একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল—সেটি যোগেশের; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দুটি সংস্কৃতির ধারাই সমান্তরাল খাতে বইতে লাগল। যোগেশ একবার সজনীকান্ত দাসের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দেব লেনের বাড়ীতে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন আচার্য্য যদুনাথ সরকার। সংস্কৃতভারতীর সাধক হরিদাস সেদিন বাংলাভাষার সাহিত্যিক ও সমালোচককে প্রাণখুলেই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। এদিকে যোগেশের প্রভাবে ও প্রেরণায় হরিদাসের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব একে একে পাশ্চাত্য রীতিতেই শিক্ষালাভ করে কৃতবিদ্য হলেন—সংস্কৃতভারতীর পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে কেউই বিশেষ দীক্ষা নিলেন না। হরিদাস কিন্তু আপত্তি তুললেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পিতাপুত্রের মাথার ওপরে মতান্তরের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। সে মেঘে কখনও অবশ্য বিবাদ-বিচ্ছেদের ধারাবর্ষণ হয় নি—তার কারণ হরিদাসের ধৈর্য্য, সংযম ও যুক্তিনিষ্ঠা এবং যোগেশের পিতৃভক্তি।

হরিদাস তাঁর প্রজ্ঞার আলোতে বোধহয় একটি গ্রহণযোগ্য সমন্বয়-সূত্রেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি নিজের চোখের সামনে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণাগুণ ও প্রভাব দেখে ও বিচার করে জমার ঘরে নিশ্চয়ই একেবারে শূন্য ফেলতে পারেন নি। তাই তিনি উত্তরকালে যোগেশের মুখেই তিনি দেশবিদেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের কথা শুনতেন, এবং যোগেশের চোখ দিয়েই বাইরের দুনিয়াকে দেখতেন। যোগেশই পৌর সম্বর্দ্ধনা সভায়, জোড়াসাঁকোর কবিতীর্থে পুরস্কার বিতরণীসভায় হরিদাসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হরিদাসের পক্ষে বিভিন্ন সংস্থা ও বিশিষ্ট মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন যোগেশ। শেষদিকে পিতা-পুত্রের সম্পর্কও ছিল মাধুর্য্যেভরা।

যোগেশের যুক্তির তোড়ে হরিদাস প্রভাবিত হলেও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সাধারণভাবে বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের সমর্থকই ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও—আরতি বললেন—"অব্রাহ্মণ হলেও রজনী সন্ন্যাসীকে দাদু গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বিলেতে যাবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; অথচ বিলাতফেরতের পাণ্ডিত্যকে তিনি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। তিনি থাকতে বাড়ীতে কত না পণ্ডিতই এসেছেন। তাঁর সামনে অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমরা প্রণামই করতাম। তিনি আপত্তি করতেন না।" কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বংশে শাস্ত্রীয় শিক্ষার ধারা

অবলুপ্ত হয়ে যাবে, এ কথাও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলত।

সবশেষে আরতি ধরা-গলায় ধীরে ধীরে বলে গেলেন—"শেষদিকে দাদু একেবারে বদলে গিয়েছিলেন। ভারী কাজ তাঁর তখন শেষ হয়েছে, সব পাওয়া তাঁর হয়ে গেছে। তখন তিনি যেন প্রশান্তির প্রতিমূর্ত্তি। সত্যিকারের সুখে ছিলেন তিনি—সকলকে নিয়ে জড়িয়ে ছিলেন। আমরা তখন সকলেই বড় আপনার করে দাদুকে পেয়েছি। কিন্তু সে সুখ, সে আনন্দ—হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেল। দিদির কাছে কবে যেন তিনি দশটা পয়সা ধার করেছিলেন। শেষ রাতে খেয়াল করে সে ধার শোধ করে পরের দিন সকালে তিনি চলে গেলেন। আমরা তাঁর কোনো ধারই আজ পর্য্যন্ত শোধ করতে পারলাম না।"

॥ নয় ॥

হরিদাসের জীবন কাহিনীর প্রায় শেষ অনুচ্ছেদে এসে আমরা পৌঁছেছি। হরিদাসের বয়স এখন পঁচাশি বছর। দেশের সরকার ও দেশবাসীর কাছে তিনি পেয়েছেন সম্মান ও অভিনন্দন। কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনেক সংস্থা তাঁকে সভাসমিতি ও মানপত্রের মাধ্যমে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। গবেষণার সাধন-পীঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে বিশিষ্ট সদস্যপদে ও সহ-সভাপতিত্বে বরণ করেছেন এবং দিয়েছেন যাবজ্জীবন অধ্যাপক-সদস্যের সম্মান। সর্বোপরি মহাভারতের অনন্যসাধারণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি তখন কৃতার্থ ও পূর্ণ। আর কেন তিনি 'বৃথোদ্যমম্' করবেন? তাই তিনি আর 'সমাজ সংস্কার' 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ঃ', 'বিক্রমোর্ব্বশী' (টীকা গ্রন্থ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি প্রকাশের কথা চিন্তাও করেন নি। তাঁর 'ভগবদ্গীতার প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদ' নামে প্রবন্ধটি অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৬৫ সনে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর কর্ম্মযজ্ঞ তখন শেষ হয়েছে। তাঁর নাতি-নাতনীরা ফিরে পেয়েছে তাদের স্নেহময় ও আনন্দময় দাদুকে। দানধ্যান অবশ্য তখন তিনি করেছেন, কিন্তু খুঁটিনাটি কিছু আমাদের জানা নেই। ১৩৬৬ সন থেকে প্রতি বছর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পুরস্কার; কাব্যের উপাধি, 'ক' স্মৃতির উপাধি এবং

পুরাণের উপাধিতে রৌপ্যপদকের পুরস্কারের জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষাপর্ষদকে ৪০০০ টাকা দিয়ে গেছেন।

১৩৬৮ সনের ৮ই পৌষ সোমবার দিনের বেলা তিনি ভালই ছিলেন। দুপুরের দিকে একটু যেন তাঁর শ্বাসকষ্ট সুরু হয়। ওষুধের গুণে কষ্ট কিছুটা কমে বটে—কিন্তু তা সাময়িক। রাত বারটা নাগাদ আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়—তখন আর ওষুধে কোনো ফল হয় না। তিনি বোধহয় সব বুঝতেই পেরেছিলেন। তাই রাত প্রায় দুটোর সময় বিছানায় বসে শেষবারের মত আয়েস করে তামাক খেয়ে নিলেন। পুত্র পৌত্র পুত্রবধূগণকে, আত্মীয়স্বজনকে ডেকে শেষ কথা সেরে নিয়ে শান্তচিত্তে চরম ও পরম মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১৩৬৮ সনের ৯ই পৌষ মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের সময় এল তাঁর বন্ধনক্ষয়ের পুণ্যলগ্ন। শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাগণ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশবাসী এবং তাঁর অক্ষয়কীর্তিকে রেখে তিনি মহাযাত্রা করলেন জ্যোতির্ম্ময় লোকে। শোকবার্তা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেব লেনের বাসভবনে গিয়ে হরিদাসকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোকযাত্রার অনুগমন করে শ্মশান ঘাটেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁর অগণিত অনুরাগীবৃন্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাংস্কৃতিক সংস্থা ও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যার্ঘ্য অর্পিত হয়। তারপর যথা সময়ে শাস্ত্রীয় বিধিমতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে।

জ্ঞান ও কর্ম্মতপস্বী হরিদাস, ছিলেন সেই 'প্রকৃতরূপে জীবিত' মুষ্টিমেয় মহামানবদের মধ্যে একজন যাঁরা 'মননের' দ্বারাই জীবিত থাকেন। তিনি ছিলেন ভারত সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভারতীর পুনরুজ্জীবন মন্ত্রের সাধক। তাই বোধহয় তিনি 'মহাভারতম্'-এর মহাসাগরতীরে সর্বশ্রেণীর পাঠককে মিলিত করে তাঁদের সঙ্গে এক হয়েই চলতে চেয়েছিলেন; 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'*—বৈদিক ঋষির এই বাণীর মধ্যেই হয়ত তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সাধন-সঙ্কেত।

পরিশিষ্ট

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র, পৌত্র ও পৌত্রীদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বা আছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১। প্রথম পুত্র শ্রীশশিশেখর ব্যাকরণ-কাব্য-পুরাণতীর্থ। ইনি দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে স্ব-গৃহস্থ সিদ্ধান্তবিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকরূপে বৃত আছেন।

২। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ব্যাকরণ-কাব্য-স্মৃত্য-পুরাণতীর্থ। ইনি সুদীর্ঘকাল সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন বিষয়ে ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে "বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী"র প্রকাশনে ব্যাপৃত আছেন।

৩। তৃতীয় পুত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র ইংরেজীর প্রখ্যাত অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। ইঁহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

৪। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীভবেশচন্দ্র বর্ত্তমানে দমদম মতিঝিল কলেজে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। ইনি আমেরিকান অর্থনীতির উপরে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতীয় অর্থনীতির উপরে ইঁহার কয়েকখানি পুস্তকও আছে।

৫। শ্রীহেমচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরজত ভট্টাচার্য্য কলিকাতা উমেশচন্দ্র কলেজ ও সিটি কলেজ (কমার্স ডিপার্টমেন্টের) ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে প্রায় দশ বৎসর কাল নিযুক্ত আছেন।

৬। শ্রীহেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'এম্-টেক্' ডিগ্রী এবং ফলিত রসায়ন শাস্ত্রে 'পি, এইচ্, ডি' ডিগ্রী অর্জ্জন করেন এবং বর্ত্তমানে আমেরিকায় উচ্চতর গবেষণার কার্য্যে ব্রতী আছেন।

৭। শ্রীযোগেশচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য্য (গুহ) দীর্ঘ ১১ বৎসর কাল দার্জ্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকারূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং গত ৪।৫ বৎসরকাল কলিকাতা মৌলানা আজাদ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকারূপে নিযুক্ত আছেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক মহিলাদের মধ্যে প্রথম অধ্যাপিকা।

৮। শ্রীযোগেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ডঃ দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে এম, এ ডিগ্রী এবং ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী অর্জ্জন করেন এবং গত ৮ বৎসর কাল অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। অর্থনীতি বিষয়ে ইঁহার গবেষণাত্মক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত এবং ইনি সমগ্র পৃথিবী দুইবার পরিভ্রমণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত হইয়া ইনি বিভিন্ন স্থানে ইউনেস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়াছেন এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

৯। শ্রীযোগেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীধীরেশচন্দ্র কিছুকাল ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং গত সাত বৎসর কাল গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, 'তিলজলা ব্রজনাথ বিদ্যাপীঠে' প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

১০। শ্রীযোগেশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীবীরেশচন্দ্র গত ১৫ বৎসর কাল পুরুলিয়া জগন্নাথকিশোর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

১১। শ্রীযোগেশচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র শ্রীঅমিতাভ কিছুকাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কার্য্য করেন। এ বৎসর তিনি B. Ed. পরীক্ষা দিয়াছেন।

১২। শ্রীযোগেশচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র শ্রীঅতীশচন্দ্র সিটি কলেজ বিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগে ইংরেজীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

Extracts from Bengal District Gazetteers,
Faridpur, published in 1925,
By L.S.S.O' MALLEY, C.I.E.

KOTALIPARA - "···The chief interest of the place lies in the existence of a great fort still in a good state of preservation ; the walls, which are made of earth, are fifteen to thirty feet high and measure two to two and a half miles each ; the accounts of the size of the fort vary, for one says that it measures 2½ miles by 2½ miles, while another states that each of the walls is about 2 miles long. At any rate, it is the largest fort in Eastern Bengal, the only one comparable to it being the fort called Garh Jaripa, a few miles north of Sherpur in the district of Mymensingh, which measures two miles by one or one and a half mile. It has been surmised that the name Kotalipara means the hamlet (para) on the ramparts (ali) of the fort (kot) .."

"...'Kotalipara', he says, 'is at present surrounded on all sides by big marshes extending over scores of miles, and it is inconceivable that any sane man could think of a royal settlement in such a water-logged area. But the big fort is there, and brick constructions very often come up unexpectedly from low water-logged places. The truth has been guessed by Mr Pargiter and others—that the low level of Kotalipara is the effect of subsidence due to earthquake. It is not difficult to guess when subsidence took place when we find a new town springing up during the reign of Dharmaditya which does not seem to have existed in the third year of the same reign.' ·"

Extracts from 'The Statesman,'
The 6th December 1933

NEW TITLE-HOLDERS

"Mahamahopadhayaya Pandit Haridas Siddhantabagish : You are not only a scholar and research worker of great and varied erudition, but a poet of distinction. The number of your pupils who now occupy prominent positions proves your striking success as a teacher, while your learning and industry also appear from your many valuable publications in Sanskrit."

" . ....Modern Sanskrit literature has enough in it to interest any objective Connoisseur. In its volume, content and presentation it can easily match some of the best pieces in world literature."—Preface (xi)

"In one of his plays the author calls himself :

মহাকবিপ্রাপ্যযশোঽভিলাষী ।

'Desirous of the fame attaching to a great poet.' It is really fortunate that this desire of his is quite adequately fulfilled. The author is certainly known as a Mahakavi (a great poet) of the twentieth century " (Page—102)

Extract from 'Prolegomena' of 'The Mahabharata' (1st volume) Published from Poona Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933, and edited by Vishnu. S. Sukthankar.

PROLEGOMENA

" . What the promoters of this scheme desire to produce is briefly this : a critical edition of the Mahabharata in the preparation of which all important versions of the Great Epic shall have been taken into consideration, and all important manuscripts collated, estimated and turned to account "

(Pages III & IV)